বাঙ্গালী চরিত।

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসীষ্টেসিনপ্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

১২৯২ সাল।

সূচিপত্র।

বাঙ্গালী-চরিত।

দ্বিতীয় ভাগ।

পূজার চিঠি।

১৫ই আশ্বিন, রাত্রি ৮ টা।

স্ত্রী, স্বামীকে।

প্রাণের নগেন,

আমি তোমায় এত পত্র লিখি, কিন্তু তুমি তার সময়ে উত্তর দাও না। তোমার জন্য মন যে কি করে, তা আর কি বল্‌বো। রোজ রোজ এক এক খানি তোমার পত্র পেলে তবুও কতক সন্তুষ্ট থাকি, তাতেও বঞ্চিত: সপ্তাহে দুখানি বৈ পত্র লেখ না। তোমার জন্য ভেবে ভেবে শরীর শুখায়ে যাচ্চে, খেতে পারি না, মুখে অন্ন রোচে না, এ অধিনী কেবল সারাদিন তোমার জন্য ভাবে। সকালে ঘুম থেকে শ্বাশুড়ী উঠিয়ে দিলে, অমনি যাহোক একটু জল খেয়ে তোমার জন্য ভাবি; স্নানের পর তিনি আবার জল খেতে দেন, না-পারি-না-পারি করে, অতি কষ্টে জল খেতে খেতেই তোমার কথা কত মনে পড়ে! তারপর মধ্যাহ্নে তিনি আবার সম্মুখে এক রাশ ভাত বেড়ে ধরেন, তাকি আমার আর পোড়া খিদে আছে! কিন্তু কি করি শ্বাশুড়ি বকেন, রাগ করেন, তিনি

যে আমাকে জ্বালা যন্ত্রণা দেন, তাত তোমার অগোচর নাই! (সে সব কথায় এখন কাজ নাই; ঈশ্বর যদি দিন দেন—তুমি ঘরে এলে সব কথা হবে) আমি কেবল তোমার খাতিরে তাঁকে কিছু না বলে, ভয়ে ভয়ে ভাতগুলি খাই! তখন যে কত কষ্ট হয়, সে কথা আর কি বল্‌বো—একে অনিচ্ছায় ভাত খেয়ে শারীরিক ব্যথা, তার উপর তোমার জন্য মানসিক কষ্ট! নাথ! তখন এই উভয় কষ্টে অচেতন হয়ে, বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তোমার কথা ভাবি —তাই কি এ পোড়া কপালে একটু সুস্থির হয়ে ঘুমাবার যো আছে যে, তোমার কথা একটু ভাব্‌বো আর কষ্ট লাঘব কর্‌বো? বলিলে বিশ্বাস কর্‌বে না, সন্ধ্যা না হতে হতেই শাশুড়ি আমাকে "উঠ উঠ সন্ধ্যা হলো" বলে জোর করে উঠিয়ে দেন। আমি কাঁচা ঘুমে উঠে চক্ষু মেলিতে পারি না, কেবল ঢুলি, এতেও নিস্তার নাই; তখন ঘরের সকল কাজই খুটি নাটি উনকোটি চৌষট্টী কর্‌তে হয়—যেটী না কর্‌বো সেটী ত আর হবে না; আর শাশুড়ী তখন এক গাছা কাঠের মালা লয়ে পা মেলিয়ে হরি নাম ঠক্‌ঠকাতে বসবেন, কারো সঙ্গে কথা কন না; আমার যে তখন খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠ্‌ছে, তা একবারও দেখেন না। নাথ! তখনও তোমার কথা ভাবি। এ সংসারে তোমা বই আর কাহাকেও জানি না। আমার যে এখানে এত কষ্টে দুঃখে কাল যাচ্চে, সেজন্য আমি কিছুই চিন্তিত নহি,—আমার ভাবনা, পাছে তোমার সেখানে কষ্ট হয়!

আজিকার ডাকে তোমার পত্র না পেয়ে মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। বড় সাহেব সত্য সত্যই কি পূজার সময়ে তোমায়

ছুটি দিবেন না? পূজার সময় তোমার বাটী না আসা হলে ত আমি বাঁচিব না! এ দাসী নিতান্তই প্রাণে মরিবে! এ সংসারে কিছুরই কাঙ্গালী নহি, কোন সাধ নাই, কেবল তোমার চরণ-যুগল দর্শনপ্রার্থী। নাথ! অধিনীর মুখপানে চেও। আমি পূর্ব্বের পত্রে যে সকল জিনিসের ফর্দ্দ দিয়ে ছিলাম, তাহার কিছুই চাই না, কেবল তুমি একবার এসো। পাছে তুমি মনে কর, আমি রাগ করেছি, তাই যে দুই একটি জিনিস না হলে নয়, তাহারই ফর্দ্দ দিলাম। আমার জন্য এক খানি গুলবাহার ঢাকাই কাপড় আনিবে। দেখ যেন মুখুয্যেদের ছোট বউয়ের মত ঢাকাই হয়; ওবাড়ির বড় কর্ত্তা ঢাকা থেকে যেমন কাপড় আনিতেন, ঠিক সে রকম কাপড় হলেও চল্‌তে পারে। পূজার সময়ে পাঁচ বাড়ীর বউ ঝির সঙ্গে দেখা করিতে হয়, নেহাত খারাপ ঢাকাই পরে কেমন করে পাঁচজনের সাক্ষাতে বার হবো, আমি নিজের জন্য তত দুঃখিত নহি, পাছে অপরের কাছে তোমার মুখ হেঁট হয়—এইটীই আমার বড় দুঃখ। কেহ তোমার নিন্দা করিবে, তাহা আমি সহিতে পারিব না। আর এক যোড়া খুব মিহি, চটাল, কালার পাছাপেঁড়ে লাল বাগানে কাপড় চাই। এটীরও বিশেষ দরকার। প্রত্যহ একখানি ঢাকাই পরিলে লোকে বলিবে, বুঝি উঁহার ঐ খানি বৈ আর কাপড় নাই; পাছে কেহ তোমায় দোষে, ইহাই আমার ভয়। আর একটি আমার সাটীনের জামা চাই—সেত দেবার কথাই আছে। বাক্স, সাবান, পমেটম, তাস, পশম, আতর, গোলাপ, লাবেণ্ডার,—ঘোষেদের মেজবৌয়ের মত একটি ভাল শিশি, হরি কাকার মত এক খানি ছুরি, ওবাড়ীর যামিনী দিদির মত এক খানি কাঁচি, গোলাপফুলের মত ৮টী

কাঁচের পুতুল—এই গুলি সব মনে করে কিনো। আর একটা মনে পড়িয়ে দি; পাক দেওয়া বালা ও ফুল ঝুমকাটী ভুলো না; আর বছরের মত পূজার সময়ে ষষ্টির দিন এসে যেন বলোনা—"সেকরা দিলেনা"। এবৎসরও দুটি গহনা না হলে লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হবে, বিশেষ মল্লিকা দিদির এবারে ৪।৫ খানা নূতন গহনা হয়েছে; আমি যে তার কাছে সব পুরাতন সাবেক গহনাগুলি পরিব, তা কখন পারিব না। গহনা না পরিতে হয় তাও স্বীকার, তবু সব পুরাণ গহনা পরিতে পারিব না। ভাল কথা মনে পড়িল—পুরাণ গহনাগুলি নূতন রং করাতে হইবে। তাহার শীঘ্র বন্দোবস্ত করে কলিকাতা হইতে লোক পাঠাইয়া দিবে। আর আমি কিছুই চাই না—কেবল একটি ভাই আছে, তাহার জন্য ধুতি, চাদর, জুতা জামা অবশ্য অবশ্য আনিবে, মায়ের জন্য এক খানি ভাল পাটের কাপড় আনিবে—মা তোমায় কত আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন! তোমার একে মাহিনা, ৪০৲ টাকা? আর কিছু বেশী খরচ পত্র করে কাজ নাই, বেশী কোথা পাবে—দুটাকা থাক্‌লে আখেরে কাজ দেখ্‌বে। আমার শ্বাশুড়ীর জন্য এ বছর আর কাপড় আনিতে হইবে না; তিনি কাপড়ের মর্ম্ম বুঝেন না; গত বৎসর যে থান কাপড় খানি দিয়াছিলে, তাহাই শ্বাশুড়ী পুতু পুতু করে তুলে রেখেছেন। সে কাপড় পোকায় কেটে নষ্ট কর্‌তেছে, বস্তা পচা হতেছে, এমন দেবার দরকার কি আছে? সে এক টাকা থাকিলে আমার মলের বাণির দেনা শোধ যাবে! কিন্তু তুমি খর্‌চে মানুষ বলে কিছুতেই তোমার কুলায় না। ঠাকুরঝির জন্যও কাপড় আনিতে হবে না—তুমি একলা মানুষ—কোথা পাবে?—পাচ জনকে লইয়াই তোমার ঝঞ্চট।

আমি না হয় তাহাকে এক খানা আমার আর বছরের কাপড় দিব। বেশ বুঝে শুঝে খরচ পত্র করিবে—অসময়ে কেউ দু-টাকা দেয় না। কিন্তু তুমি আমার কথা শুন কৈ?—আমার কথা শুনিলে কি এত্‌ দিন মলের বাণির দেনা থাকে; পূর্ব্বে পত্রে লিখেছিলে, আমার জন্য যে নব বৃন্দাবন প্রভৃতি বই আনিবে, যদি খরচের টানাটানি হয়, তবে তাহা আর আনিয়া কাজ নাই। আমি এ সব বুঝি, বই না আনিলে রাগ করিব কি?—না; বুঝিব, তোমার সঙ্গতি নাই কোথা পাবে?—কিন্তু লোকে বুঝে কৈ? এইত আমার দুঃখ। অধিনীর নিবেদন ইতি।

তোমারই কুসুম।

পুনঃ—

আমি আশা-পথ চাহিয়া আছি। এ অবলার প্রতি দয়া করিয়া যেমন করে হউক, ছুটীতে পূজার সময়ে বাটী আসিবে। যদি আমার কপাল মন্দ হয়, যদি একান্তই না আসিতে পার, তবে ফর্দ্দমত জিনিসগুলি পাঠাইতে যেন বিলম্ব না হয়, চতুর্থীর পর্ব্বেই যেন পাই। এ দাসী তোমা বই আর কাহাকেও জানে না।

তোমারই কু:—

মহাগীতি।

আয় মা কল্পনা সতি! গাব প্রেমরসে
গৌড় ভূমে আজ নগেন-কুসুম গীত—
এক ফোঁটা সুধা—আনন্দে করিবে পান
বঙ্গবাসী যত, নিরবধি। ত্রেতায় যেমতি
চোর রত্নাকর. কবি রত্নাকর এবে
অতুল জগতে গেয়েছিল, মহা গীত
রামসীতা কথা। ইংরেজী এলেমহীন
চোর সে বাল্মীকি, তবু গেয়েছিল ভাল।
সাধু আমি—নারীরূপ হেরি নাই কভু
নয়ন ভরিয়া, জানি লাটীন ইংরেজী
বাঙ্গালার ত কথাই নাই—অবশ্যই গাব ভাল।
তেঁই দেবি নমি তব পদে বারে বার
অবনী লুটায়ে। শুনিয়াছ মধু মাসে
সহকার শাখে, কোকিল কাকিলী, মধুসম
বাশরী স্বরলহরী যমুনা পুলিনে,
নারদের বীণাধ্বনি কৈলাস-শিখরে;
কিন্তু শুন নাই কভু (সাহসি বলিতে পারি)
এহেন মধুর গীত: শুন মন দিয়া,
প্রাণ দিয়া, নরনারী যত, কলিকালে
বঙ্গভূমে: শুনেছিল যথা রাজা পরিক্ষীৎ
শুকদেব মুখে শ্রীমদ্ভাগবত কথা,
দ্বাপর কলির সন্ধিকালে (শমীকের শাপে)

যমুনার কূলে ছিল যবে রাজ্য পাট ছাড়ি।
পূর্ব্বের গগন-ভালে উদেছে অরুণ;
তামাক খাবার টীকে ধরাবে নগেন,
ঝড় ঝড় ঝাড়িছে চকমকি; চক্ চক্
চকিছে আগুণ; ফণিমণি পদে যথা
আন্ধার ভবনে; কিন্তু ভিজা সোলা হায়!
অব্যর্থ সন্ধান সদা হইতেছে ব্যর্থ!
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী
গিয়াছিল স্বর্গপুরে ইন্দ্রের সদনে—
(হর কোপানলে কাম যেনরে না পুড়ি)
সুন্দরী উর্ব্বশী ধনী ভেটেছিল পার্থে;
ব্যর্থ সুররঙ্গিণীর—অব্যর্থ সন্ধান—
করেছিল সে ফাল্গুনি দ্রৌপদী-মোহন।
হেন কালে উতরিল কুসুমের চিঠি
নগেনের হাতে; পত্র দেখে কাঁপে হিয়া,
শুকাইল মুখ—পত্র পড়ে অচেতন
হন; বীরবাহু শোকে লঙ্কাপতি যথা।
উঠি পুন বিলাপিলা বহু, ক্ষীণ স্বরে;
"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি,
তাও বুঝি ছিঁড়ে লয় কাল এ অকালে;
বৃথা মানবজন্ম ধরেছিনু আমি,
প্রেয়সীর আশা কভু নারিনু পূরাতে;
ইচ্ছি, তুষানলে জুড়াই মনের জ্বালা,
—এদারুণ জ্বালা যদি পারি নিবারিতে;
অথবা অজ্ঞাতবাসে যোগীবেশ ধরি

ফিরি দেশে দেশে দ্বাদশ বৎসর কাল।
হায় বিধি! যবে আছিনু সূতিকাগারে—
সৈন্ধব লবণ কেন দেয় নাই মুখে
দুষ্টা ধাই: দীন আমি অকৃতি অধম;
দয়াময়! ডাকি হে তোমায় কাতরে
দীনবন্ধু দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ প্রভু!"
ভিজে অশ্রুনীরে; ভিজে গণ্ডস্থল; ভিজে
গোঁফ দাড়ি; ভিজে বক্ষ, কক্ষ; ভিজিলরে
কাপড় চোপড়! বহিল শোকের কালাপানি?
যথা যবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধন
আদি শত পুত্র হলে হত, কেঁদেছিল
গান্ধারী দেবী। হেন কালে সখা তার
নাম নরহরি, এক পাঠশালের পড়ো,
এবে এক আফিসের সহচর; উপনীত
হলো; জিজ্ঞাসিল "বন্ধু! বল বল
মুখশশী মেঘাবৃত কেন? মন্দাকিনী
ধারা কেন নয়নের কোণে? কি হয়েছে?
মেরেছে কি কেউ?" উত্তরিল শ্রীনগেন্দ্র,
"শুন সখে, মর্ম্মকথা; মারে নাই কেহ—
আপনার দোষে সদা খাইতেছি মার;
বিষাদ সলিলে পড়ে হাবুডুবু খাই—
হায় সখে! কি আর বলিব সে বারতা,
স্মরিলে সে কথা হৃদি কাঁপে গুরু গুরু—
হৃদয়বৃন্তে ফুটেছে একটি কুসুম,
কিন্তু মরুময় হৃদে বল কত দিন

আর সে তিষ্ঠিবে? শুখাবে কুসুম এবে.
শুখাবে হৃদয়? শুখাইবে সেই সঙ্গে
বন্ধু তব; হায়! কোথা সে বালককাল—
ধূলিখেলা করিতাম যবে পথে পথে!
আন ভাই হলাহল ভখিয়া মরিব,
কিম্বা জ্বাল অগ্নিকুণ্ড পশিব তাহাতে
এ অন্তিমে বন্ধু-কাজ কর তুমি ভাই।"
এতেক বিলাপি বন্ধু, দিল বন্ধু হাতে
কুসুমের পত্র। হরিহর পড়ি পত্র,
বুঝিল সকল। বলিলেন, ধীরে ধীরে
"দেখিতেছি বিধি বাম, রন্ধ্রগত শনি।"
ক্ষণেক নিস্তব্ধ দোহে; কতক্ষণ পরে
কহিল নগেন্দ্রনাথ সকাতর স্বরে—
"দুটি ডিক্রী ঝুলিতেছে, মস্তক উপর
সুবর্ণকারের। ভীটা, বাড়ী বাঁধা—
জানত সকলি—মাহিনার কীস্তিবন্দি।
জুতাবুরুষের কড়ি হাতে নাই মোর—
জল খাই ভাঁড়ে, নিজে রাঁধি, শুই চটে,
উনানে পাড়িয়া ফুক চোখে ঝাপসা দেখি
—না লিখিল মৃত্যু কেন বিধাতা ললাটে।"
উত্তরিল হরিহর—"বলি শুন, যাও
গৃহে; বুঝাও কুসুমে—অবোধ সে নয়,
তোমাগত প্রাণ—দুঃখে দুঃখ সুখে সুখ
তার।" বলিল নগেন্দ্র, "আশ্বাসে রেখেছি
তারে বার মাস—আজ কেমনে বলিব,

পাপী আমি—'কিছু নাই, সব শূন্যাকার,
প্রিয়া রোষিবেন যবে, কে রোধিবে তবে
সেই রোষ-গতি—কে রোধে নদীর গতি
যবে ধায় সে সমুদ্রের পানে দ্রুত ;
দেখিয়াছি দ্রুত ইরম্মদে ধেয়ে যেতে
আকাশের পথে, দেখিয়াছি বাজবৌরির
গতি ; দেখিয়াছি নক্ষত্র পতন ; কিন্তু কভু
দেখি নাই আমি (দেখে নাই কেহ কভু)
প্রিয়ার সে রোষগতি। ভাই ! ধার দাও
দুটী টাকা, পলাই এদেশ হতে শীঘ্র"।
বন্ধু দিল টাকা, পলায় নগেন্দ্রনাথ,
একছুটে কাঁদিতে কাঁদিতে,—যথা যবে
মহাভারতের শেষে আশ্রমিক পর্ব্বে—
সঞ্জয় গান্ধারী আর কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র,
সংসারের মায়া ত্যজি গিয়াছিল বনে
কলেবর পরিত্যাগ হেতু। ফুরাইল কথা
এত দূরে। সতেজে লিখিনু ছন্দ বীরদাপে ;
পার্থিব অক্ষর কভু না করি গণনা,
মহাকবি মোরা ; আর কিছু দিন পরে
লিখিবগো ঢালা (গদ্য সম) ব্লাঙ্কভার্স—
গৌড় জন যাহে সদা যাবে গড়াগড়ি।

—০:০—

তত্ত্বকথা।

(১)

গুপ্তপুরের পালেদের বাড়ি পূজার ভারি ঘটা; ১২ মণ ময়দার বরাদ্দ; এক দল যাত্রার বায়না ৪৫০ টাকা। সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুরনিবাসী কৃষ্ণধন মুখুয্যেও পূজা আনিয়াছেন, কিন্তু কর্ত্তা বুড়া বড় কৃপণ, ছেলেদের ইচ্ছা একটু জাঁকজমক হয়। লোকে বলে, বুড়া যকের ধন আগুলিয়া আছে, কার টাকা খরচ করিবে? অতি কায়ক্লেশে গোছে গাছে পূজাটি মাত্র আনিয়াছেন। নীলমণি ঠাকুর সপ্তমী পূজার দিন বেলা ১ টার সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া কৃষ্ণধনের বাড়ি উপস্থিত। বুড়া জিজ্ঞাসিল "কেন হে কি হয়েছে, এত হাঁপাইতেছ কেন"? নীলমণি উত্তর করিল— "মহাশয় বলব কি, বড় বিপদে পড়েছিলাম, ওষ্ঠাগতপ্রাণ হয়েছিল—আগে একটু জল দিন।" বুড়া—"দিচ্চি দিচ্চি— একটু বিশ্রাম কর, হয়েছিল কি বল দেখি"? নীলমণি— "আজ্ঞে আর একটু হলেই মারা পড়েছিনু—পালেদের বাড়ী পূজা দেখ্‌তে গেলাম, পূজা বাড়ীতে ঢুকেই প্রাণ বার হবার উপক্রম হলো, লোকের কলরব, ঘিয়ের গন্ধ, দই ক্ষীরের কাদা, সন্দেসের ছড়াছড়ি, কাঙ্গালির হুড়াহুড়ি—দেখে শুনে আমার ত্রাহি ত্রাহি ডাক উপস্থিত হলো—কি করি, বাহিরে আসিতে পারিলে বাঁচি, ভাবলাম কোথায় গেলে রক্ষা পাই—তাই দৌড়িয়া আপনার বাড়ী পলাইয়া আসিয়াছি। আহাঃ এখানে মায়ের কেমন প্রশান্তমূর্ত্তি, কোন গোলটি নাই—কি সুখেরই স্থান! মাতঃ জগদম্বে! তুমিই যথার্থ দুর্গা, তোমাকে শত শত প্রণাম।"

(২)

বড় বাড়ীর বারাণশী মিত্র খুব জাঁকাজমকে পূজা আনেন। নিমন্ত্রণপত্রে সহর ছাইয়া দেন, কি ছোট, কি বড় কাহারাও বলিবার যো নাই যে, তাহার পত্র আসিল না। তবে দুষ্ট লোকে শ্লেষে কাণাকাণি করে যে, বারাণশী বাবু মাছের তেলে মাছ ভাজেন এবং অবশিষ্ট তেল টুকু গড়াইয়া বোতলে পুরিয়া রাখিয়া দেন। দেশের লোকের স্বভাব মন্দ, তাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়। কিন্তু বাবু বড় সমদর্শী লোক, সকলের উপর সমান ভাব—যে যেমন, তার উপর তেমনি দয়া। কেমন সুচারু বন্দোবস্ত, যে যেরূপ লোক, তার তেমনি সম্মান রাখেন। তাঁহার তিন রকম জল খাবার সাজান আছে—পাছে উচুঁ নীচু হয় বলিয়া স্বয়ং সে বিষয়ের পরিদর্শনে নিযুক্ত আছেন। যিনি ১৬ টাকা কিম্বা তদধিক প্রণামী দেন, তাঁহার জন্য ফাষ্ট ক্লাস জল খাবার—লুচি, তরকারি, ডাল, মেঠাই, মতিচুর, অমৃতি, রসগোল্লা, নিমকী, খাজা, গজা, বরফী, মণ্ডা, দধি, ক্ষীর, ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। রৌপ্যপাত্রে জল—মখমলের আসন—গোলাপী খিলি—অম্বরী তামাক। ৮৲ টাকা কিম্বা তদধিক দিলে, সেকেণ্ড ক্লাস; ৮ খানি লুচি, তদুপযুক্ত তরকারি, ১ টী মতিচুর, ২ খানি জিলিপি, কম্বলের আসন, বাজারে পান, ভেলসা তামাক। ১৲ টাকার অধিক দর্শনী—তৃতীয় শ্রেণীর জল খাবার। দুই লুচি এক পয়সা মূল্যের ৪ ক্ষুদ্র গজা ১টী টানা মেঠাই, তরকারি নাই, ভাঁড়ে জল, কুশাসন, খান কতক সুপারি, একটান তম্বাক। বারণশী বাবু বেশ সূক্ষ্মদর্শী—হিসাবমত, যুক্তিমত এইরূপ ন্যায়ের অনুসরণ করেন। কিন্তু অসভ্য অশিক্ষিত লোকের এমনি দশা মন্দ

যে, নিমন্ত্রণ পত্রখানি পাইলেই আহারের লোভে পূজা দেখিতে যায়; অন্ততঃ তৃতীয় শ্রেণীর দর্শনী লইয়া যাওয়া যে উচিত, তাহা একবার মনেও ভাবে না। বারাণশী বাবু কি করিবেন!—দুষ্টের দমন না হইলে দেশ রক্ষা হয় না, তাদের যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। শুধু হাতে গেলে, শুধু মুখে ফিরিবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। (N. B.—শুধু হাতে অর্থে—১৲ টাকা বা তাহার কম দর্শনী)। সপ্তমী, অষ্টমী এইভাবে অতীত হইল। নবমীর দিন, চটি জুতা পায়ে পিরান হীন অঙ্গে একটা বিটল ব্রাহ্মণ একটি দুয়ানি প্রণামী লইয়া উপস্থিত। বারাণশী বাবু সে অভদ্রের সঙ্গে কথা কহিবেন কেন? ব্রাহ্মণের কড়চে দুয়ানি দেখিয়াই আপনাকে নিতান্ত অবমানিত বোধ করিলেন; ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া বসিয়া আছে,—অপরে ঝড়াঝড় টাকা ফেলিতেছে, এবং যে যে ক্লাসের লোক, তাহাকে সেইরূপ আহার দেওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মণ তখন কি একটা বুঝিল। উঠিয়া গললগ্নীকৃতবাস হইয়াই ভগবতীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই দুয়ানিটী মায়ের পাদ-পদ্মে ধরিয়া করুণস্বরে বলিল—হে! মহার্ঘ্যদরে জল খাবার বিক্রয়-কারিণী মা! গরীব ব্রাহ্মণ—বড় ক্ষুধা—যা পার মা, এই দুয়ানীর মত জল খাবার দাও"। বাবুর পারিষদবর্গ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—বেল্লিক ব্রাহ্মণ করে কি? পাগল নাকি? ব্রাহ্মণ উত্তর করিল—"ভাই সকল হে! পাগল নহে—বড় ক্ষুধা—পেটের দায়, মহামায়া তোমাদের বাবুকে এত টাকা রোজগার করিয়া দিতেছেন, আমাকে কি আর দু আনার লুচি দিতে পারিবেন না?"

—•○•—

বড়বাবুর চিঠি।

(বিজয়ার পর।)

৺পূজার গোলমালে আমার দেশহিতৈষী কাজের ব্যবসাটা একটু মন্দা গিয়াছিল। অসভ্য দুর্গা পূজাকারীরা (Doorga-poojamakers) তখন পুতুলের গায়ে নশ্বর পার্থিব রং দিতেই ব্যস্ত ছিল। তাহারা তখন দেশের পানে একেবারেই চাহে নাই।—বর্ব্বর বাঙ্গালা নিতান্ত বহিয়া গিয়াছিল, মূর্খতার সহিত উন্মত্ততার যোগ হইলে, যে বিষময় ফল ফলে, তাহাই ঘটিয়াছিল। কেহ বস্তা বস্তা কাপড় কিনিতেছে, কেহ হাঁড়া হাঁড়া সন্দেস দর করিতেছে, কেহ জালা জালা দয়ের বায়না দিতেছে, কেহ স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার গড়াইতেছে। এসব কি এ? ছি! আমি জানি, অসভ্য দেশে পুতুল পূজা থাকিবে; তা, বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবটা যে এখনও কিছুদিন থাকিবে, তৎপক্ষে কিছু সন্দেহ নাই; তজ্জন্য তত দুঃখ করি না; কিন্তু আসল কষ্ট এই ঐ সময় লোকগুলা এত উন্মত্তবৎ বিব্রত হয় কেন? পুতুল পূজা করিবে, আস্তে আস্তে করুক,—নিঝুম নীরব ভাবে হিন্দুরা পূজা করুক, তাতে আপত্ত করি না। এ মোশাই, একটা ঢাক ঢোল কাঁসি বাজায়ে দেশ তোলপাড় করে তোলে—ছুটীর ক দিন ত কাণ পাতিবার যো নাই। বিশ্রামের জন্য ছুটী। সেই বিশ্রামের বদলে যখন কেবল পরিশ্রম—কেবল ছুটাছুটী, হুড়া-হুড়ি, মারামারি, তখন ছুটীর সম্মান, গৌরব, স্বার্থকতা থাকে কোথা? কোথাও দেখিবে, সন্দেস লইয়া কেহ ভাটা গড়াই-তেছে, কোথাও দুধোদয়ের কাদা, কোথাও ক্ষীরের জলপ্লাবন,

কোথাও কাঙ্গালী বিদায়ের জঘন্য বিকট কলরব, কোথাও অন্নছত্রের ভাতের আসুরিক দুর্গন্ধ—এ ক্ষণভঙ্গুর প্রাণে এত কি সহা যায়? হিন্দুরা যদি প্রতি বৎসরই এই ভাবে চলে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের উচিত, ছুটী বন্দ করিয়া দেওয়া। যদি গবর্ণমেণ্ট একান্তই ছুটী বন্দ না করেন, তাহা হইলে অবশেষে আমি এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে বাধ্য হইব। অত-এব সাবধান!

ছুটীর সময় এ বৃথা গোলযোগে কত দিকে ক্ষতি দেখুন। বাজারে জিনিসপত্র হঠাৎ মহার্ঘ্য হয়। ইহাতে দেশের গরীব লোকের যে কত কষ্ট হয়, তাহা ভাবিলে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। গরীব চাসা লোক টেক্সের দায়েই বিব্রত—তাহার উপর এই হঠাৎ মহার্ঘ্যদরে জিনিস কিনিতে তাহারা পয়সা পাবে কোথা? আহা! তাহারা মাথার ঘাম দ্বারা তাহাদের রুটী উপার্জ্জন করে। রৌদ্র, বর্ষা, শিশির, শীত, অগ্নি, ঝড়, সর্প, ব্যাঘ্র, না মানিয়া তাহারা সুবৃহৎ ধানবৃক্ষ তৈয়ারি করে। শেষে ধান গাছে উঠিয়া ধান ফল পাড়িতে তাহাদিগকে কত কর্ম্মভোগই না করিতে হয়! হায়! সে সব কথা স্মরণ করিলেই আমার বুক ফাটিয়া যায়! হায়! আমি চাসাকুলের কবে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইব? হা ঈশ্বর! এমন দিন কি আসিবে না, যবে চাসালোককে আর প্রত্যহ মাঠে এক হাঁটু কাদা ঘাঁটিতে হইবে না, প্রত্যহ মাঠে ভিজিতে হইবে না,—এমন কি তাহাদিগকে সেই ভয়ঙ্কর ধানবৃক্ষের তলায় একবারও যাইতে হইবে না। কবে তাহাদের পায়ে বিলাতী বুট দেখিব, গায়ে বিলাতী দরজীর তৈয়ারি বিলাতী কাপড়ের বিলাতী কোট দেখিব, মাথায় বিলাতী ছাতা দেখিব,

মুখে বিলাতী চুরট দেখিব, শিরে শোলার হ্যাট দেখিব, গলায় বিলাতী গলবন্ধ দেখিব, হাতে বিলাতী কেতাব দেখিব? চাসা এবং বিধবা আমার এ জীবনের প্রধান লক্ষ্য! কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু কি এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিধবাকে মাছ খাইতে দিবে না? কি কুটিল স্বার্থপরতা দেখ দেখি? মাছ বা মাংস অঙ্গের যে পূর্ণতা সাধন করে, তাহা কি তাহারা বুঝে না? গরীব বিধবা পতি-ধন হারাইয়াছে বলিয়া কি সে মাছ-ধনও হারাইবে?

এ বঙ্গে কি কোন সমাজিক ম্যাট্‌সিন নাই? যদি থাকেন, তিনি আমার কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিন, আমি তাঁহার সহিত 'সেকেণ্ড' করিব। হায় হায়! কি দুঃখ! বিধবার পায়ে আল্‌তা নাই, গজেন্দ্রগমনে চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার পায়ের চারি গাছা মল ঝম্‌ ঝম্‌ বাজে না; শান্তিপুরে নীলাম্বরী মিহি কাপড়ও তিনি পরিতে পান না—সেই মোটা গোধড় থান কেবল কোমলাঙ্গের কষ্টদায়ক! আমি একলা—চারি দিকে লক্ষ লক্ষ বিধবা; কজনকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইব? তাই কেবল কাঁদি।

কি কথা বলিতে বলিতে, কি কথা আসিয়া পড়িয়াছে। মনের আবেগ এমনি! দ্বিতীয় ক্ষতি—বাণিজ্যের। 'পূজার সময় হঠাৎ বাজার মহার্ঘ্য হওয়ায় সমগ্র সওদাগরবৃন্দের ক্ষতি। একথা প্রমাণের জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না। কামৎশ্চটকা, জুলুদেশ, টিম্বক্টু, খার্ত্তুম এবং আইসলণ্ড—এই পাঁচ স্থানের পাঁচ জন প্রধান পণ্ডিত এক মতাবলম্বী হইয়া বলিয়াছেন, "হঠাৎ জিনিষ মহার্ঘ্য হইলেই ব্যবসার ক্ষতি।" সুতরাং এ কথার প্রতিবাদ নাই। ভারতে এরূপ দুঃসাহসী ব্যক্তি কেইবা আছে, যিনি ঐ পণ্ডিতমণ্ডলীর মত খণ্ডন করিতে ঔদ্ধত্য

দেখাতে পারেন? অতএব নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণীকৃত হইল, ব্যবসার ক্ষতি!

তৃতীয় ক্ষতিটা বড়ই গুরুতর। সকলে প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন, নচেৎ এ গভীর তত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠিন হইবে। ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হিন্দুসন্তান, পূজার সময়, বুড়ো মা বাপ, যুবতী ভগিনী ও ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির জন্য অম্লান বদনে বস্ত্রাদি খরিদ করে। কিন্তু ইহাতে যে স্বাবলম্বন বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তাহা একবার সে ভুলেও ভাবে না। এই কুরীতি প্রচলিত থাকার দরুণই, ভারত আজ পরপদানত। আমি রোজগার করিব, অপরে বসিয়া খাইবে, আমার মুখটী পানে চাহিয়া আলস্যে কাল কাটাইবে—বঙ্গের এ জঘন্য প্রথার প্রশ্রয় দেওয়া নিতান্ত গর্হিত। মাতাই হউন, আর পিতাই হউন,—কেহ যে পরপ্রত্যাশী হইয়া জীবন যাপন করিবেন; ইহা আমি অনুমোদন করিতে পারি না। মা বুড়া হইয়াছে, বেশ কথা! খাটিবার শক্তি নাই, আরও উত্তম! সে বোসে বোসে কার্পেটের কাজ করুক্। যদি বল মায়ের চোখে চাল্‌সে ধরিয়াছে, ছানি পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, আচ্ছা, তাতে ক্ষতি নাই,—সে চস্‌মা ধরুক্। সলমন-কোম্পানীর বাড়ী থেকে আমি তাঁকে চস্‌মা কিনে দিতে রাজী আছি, কার্পেটের কাজের জন্য, উপযুক্ত জামীন লইয়া, মূলধন দিতেও অনিচ্ছুক নহি; কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে একটী পয়সাও দিতে পারি না। এরূপ দানে লোকের মনে ভিক্ষা বৃত্তির লালসা বলবতী হয়। ভিক্ষুক তৃণ অপেক্ষাও লঘু। বাঙ্গালী ক্রমশ এরূপ লঘু হইয়া পড়িলে দেশ উদ্ধার কে করিবে? কিন্তু এদিকে দেখ, মা কার্পেটের কাজ আরম্ভ করিল, মাসে দু জোড়া করিয়া জুতা

বুনিতে লাগিল, মহাজনের টাকার সুদ দিয়া পশমের দাম বাদে মাসে আড়াই টাকা স্বয়ং তাহার রোজগার হইল!—ইহাতে তার কত সুখ ভাব দেখি? মা যখন আপন পরিশ্রমলব্ধ ধনে নিজ রুটী তৈয়ারি করিবে,—তখন তাহার চক্ষু দিয়া কি আনন্দাশ্রু দরদরিত ধারে বহির্গত হইবে না? সে রুটী তাহার তখন কত মিষ্ট লাগিবে! বিশেষ, পরিশ্রম ব্যতীত ক্ষুধা হয় না; অক্ষুধায় খাইলে হজম হয় না; হজম না হইলে পেটের অসুখ হয়; পেটের অসুখ হইলে, গৃহস্থের কষ্ট, প্রতিবেশীর কষ্ট, মিউনসিপালটীর কষ্ট,—আর নারীজাতি বৃদ্ধ বয়সে পেটপীড়াগ্রস্থা হইলে, নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবীনী হয় না। সুতরাং মায়ের আসন্ন মৃত্যু! আমি উপযুক্ত সন্তান। কেমন করিয়া জীবিত মাকে মৃত্যুপথে পাঠাই বল দেখি? মা কার্পেটের কাজের কারখানা খুলুক, ঐকান্তিত মনে জুতা বুনুক,—ইহাতে আহার ঔষধ দুই হইবে—পরিশ্রমজনিত ক্ষুধার উপর স্বোপার্জ্জিত ধনলব্ধ সুমিষ্ট রুটী পড়িলে, তাহা একেবারে গলিয়া দ্রব হইয়া যাইবে, মায়েরও শরীরের পুষ্টিসাধন হইবে। এ দেশের হিন্দুরা এ সব কথা বড় বুঝেন না, গভীর দার্শনিক তত্ত্ব মোটেই চিন্তা করিতে তাহারা অক্ষম। তাহারা মা বাপকে আলস্যে কাল কাটাইতে দেখিলেই বড় সুখী হয়,—মা বাপ পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকবেন, আর আমি রোজগার করে আহার যোগাইব, পরিধেয় বস্ত্র যোগাইব? ছি! স্বাবলম্বন বৃত্তিটা কি দেশ থেকে একেবারে উঠে যাবে? দেশ কি মাটী হবে? এ ঘোর দুর্দ্দশা আমি কখনই চক্ষে দেখিতে পারিব না? আমাদের ইংলণ্ডে, ইংরেজ-বাপ, ইংরেজ-মা,

কি ভাবে চলেন, একবার স্থিরচিত্তে ভাব দেখি? সন্তানের চাকুরী স্থানে, ইংরেজ-মা-বাপ উপস্থিত হইলেন, দু দিন বেশ আমোদ আহ্লাদে কাটাইলেন,—প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত। পুত্র তৎক্ষণাৎ মা বাপের আহারের দরুণ একখানি বিল পিতার সম্মুখে ধরিল। পিতাও বেশ উপযুক্ত। তিনি হিসাবে ভুল আছে কি না, ইহা অঙ্ক পাতিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন হিসাবের গোল মিটিল, অমনি তৎক্ষণাৎ একখানি চেক কাটিয়া দিয়া পিতা আহারীয় দেনা পরিশোধ করিলেন। আহা! কেমন সুবন্দোবস্ত! কেহ কাহারও মুখপ্রেক্ষী নহে! স্বাবলম্বন বৃত্তির কি অপূর্ব্ব মহিমা! আর এই যত আপদ, এই পোড়া দেশে! কোথাও কিছু নাই, এই পুতুল পূজার সময় হঠাৎ আমি মা বাপকে কাপড় দিব কেন? তারা পারে, আপনারা রোজগার করিয়া কাপড় কিনুক। আমি তাহাদের চির-আলস্যের প্রশ্রয় দিবার জন্য কাপড় কিনিয়া দিব কেন? যে স্বাবলম্বন বৃত্তির জোরে ইংরেজ আজ পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন, সেই বৃত্তির মূল্য শিকড়ে আমি কি আজ কুঠারাঘাত করিব? তবে হাঁ, আমি নিজ-নারীকে সমস্তই দিতে বাধ্য। স্ত্রীকে উত্তম উত্তম কারুকার্য্যসুশোভিত পরিধেয় বস্ত্র, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য এবং সুস্বাদু সারগর্ভ আহার্য্য বস্তু, এ সমস্তই ভূতকালে দিয়াছি, বর্ত্তমানে দিতেছি এবং ভবিষ্যতে দিব। কারণ বিবাহের ইহাই চুক্তি। আমি এ চুক্তি ভঙ্গ করিলে স্ত্রীও বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারেন। চুক্তির আইনের নিয়ম এই, কোন চুক্তি স্বেচ্ছায় আংশিক ভঙ্গ করিলে তাহা সম্পূর্ণ ভগ্ন হইয়া যায়। অতএব পুরুষজাতিকে স্ত্রীজাতির সহিত ব্যবহারে বড়ই সাবধানে চলিতে হয়। সেই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, স্ত্রীর বাক্যই

বেদ। স্ত্রীর বাক্য বেদবৎ না মানিলে পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। আমার পূজনীয়া শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীকে; সুশীলা, সুবোধা, সুন্দরী শ্যালিকাগণকে আশ্বিন মাসে বহুমূল্যের বস্ত্রাদি ও প্রচুর মিষ্টান্ন প্রদান করি বটে, কিন্তু তাহা স্ত্রীর সৎপরামর্শে। ইহার জন্য আমি দায়ী নহি। স্ত্রীর বাক্য লঙ্ঘন আইনে নিষিদ্ধ। সুতরাং আইনে বাধ্য হইয়া আমাকে এ কাজ করিতে হয়। সেই অর্দ্ধাঙ্গী প্রণয়িনী আমার মা বাপের কাপড় দিতে অনুমতি করুন, আমি এখনি দিব। ইহার যদি কখনও প্রতিবাদ করি, তবে আমার দোষ দিও।

চতুর্থ ক্ষতি বড়ই বিষম। দুধ, অসভ্য হিন্দুর হাতে পড়িয়া মাটী হয়। ছানা দুধের বিকার। কোন গুণ নাই, অসার। সেই ছানায় কতগুলা চিনি ফেলে হিন্দুরা মিঠাই তৈয়ারি করে। পূজার সময় সেই মিঠায়ের ছড়াছড়ি হয়। কেবল পয়সা নষ্ট এবং উদরের কষ্টদায়ক। আরও দেখ, দুধে ছানা তৈয়ারি হওয়ায় দুধের দাম চড়িয়া যায়। চায়ের জন্য দুধ কেবল মাত্র উপযোগী। দুধ মহার্ঘ্য হওয়ায় জনসাধারণ আর চা দিয়া দুধ খাইতে পায় না। ইহাতে ভারতীয় চাসা লোকের উন্নতি না অবনতি? আচ্ছা একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, মিঠাই খাইতে পয়সা খরচ হয়, সেই ব্যয়ে পূজার সময় কট্‌লেট, কারি, চপ খাইতে ক্ষতি কি? কাউল অতি উপাদেয় জীব—কেবল মূর্খতার দরুণ, হে হিঁদু! তাহাতে বঞ্চিত হও কেন! বিশেষ তোমারা এখন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, অতি দুর্ব্বল, পূজার তিন দিন চালাও চিকেন ব্রথ খাওনা কেন? কুসংস্কারে পড়িয়া হরি নাম কর, আপত্তি নাই; কিন্তু চিকেন ব্রথ না খাইলে হরি নাম করিবে কার জোরে? কেবল চিনির ডেলা মেঠাই খাইলে যে ডাইবিটিস্

হইবে,—এ ভাবনা কি একবারও ভাব না? সম্মুখে সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখ। আমি একলা, তোমাদিগকে কত বুঝাইব!

হায়! দেখিলাম, বুঝিলাম, বুঝাইলাম, বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবটা অতি বদ জিনিস। পুতুল পূজা করুক, কাপড় কিনুক ছানা চিনি খাউক—এসবে তত আপত্তি করিতাম না, যদি পূজাবকাশে বাঙ্গালী একটু সুস্থির হয়ে আমার দেশ ভক্তির বক্তৃতা শুনিত। কিন্তু অধঃপতনশীল বাঙ্গালী তা শুনিল কৈ? মনে করিলাম, বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া এ সময় উত্তর পশ্চিম যাই, তথায় আমার কাজের বিশেষ সুবিধা হইবে। পোর্টমেণ্ট পর্য্যন্ত বাঁধিয়াছিলাম, এমন সময় বিধি বাদ সাধিল। এলাহাবাদ হইতে তারে সংবাদ আসিল, এখানে মহরম উপস্থিত—এখন কিছু এখানে সুবিধা হবে না, আসিও না। লাহোর হইতে সংবাদ পাইলাম, এখানে হিন্দু মুসলমানে ভয়ানক দাঙ্গা—এবার এলেই মার খেতে হবে। দেখে শুনে আমার হৃদয় দমিয়া গেল। এ দিকে দুর্গোৎসব, ও দিকে মহরম, আমি যাই কোথা? আমার চলে কিসে? ব্যবসা যে বন্দ হয়! আমার ডাক ছেড়ে কান্না পাইতেছে! অগো তোমরা কেউ আমাকে কিছু উপায় বলে দিবে গো?

—০:৪:০—

গহনারহস্য।

সুমুখীর নারী জন্মটা বৃথা গেল? স্বামী অলঙ্কার ত দিতে পারে না। স্বামী কাছারী থেকে এসে শুধু "প্রিয়ে!" সম্বোধন করিলে ত দুঃখ ঘুচে না। বোসেদের বাড়ী বিবাহ উপস্থিত, বোসেদের গিন্নি তাঁহাকে আনিবার জন্য দুই দফা পাল্কী পাঠাইলেন—কিন্তু স্বামী এমনি অবুঝ অকর্ম্মণ্য, নিষ্ঠুর যে, ১২ ঘণ্টার মধ্যে গহনা গড়াইয়া আনিয়া দিতে পারিল না। সুমুখীর আজ দুঃখের অবধি নাই, দুঃখের এক বারে প্যাসেফিক্ ওসেন, ধু ধু একাকার, কুল কিনারা নাই। গহনা অভাবে সইয়ের বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইতে পারিলেন না,—এই হৃদয়-কুসুমশোষী দারুণ দুর্ভর দুঃখে সুমুখীর নয়ন-কোণ হইতে বিন্দু বিন্দু বারিধারা উভয় গণ্ডে পতিত—যেন প্রফুল্লিত পঙ্কজে শিশিরবিন্দু, মরি, মরি!

নিদয় বিধাতা কেনরে তাহারে,
ভারতে পাঠালে রমণী করে রে!

এ যন্ত্রণা শূল-ব্যাধির গুরুতর যন্ত্রণা হইতেও গুরুতর, সুমুখীর ঢের সহ্য গুণ—তাই সুমুখী এখনও দাঁড়াইয়া আছেন, নচেৎ গলদেশে রজ্জু বাঁধিয়া এতক্ষণ জীবাত্মাকে পাপ-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেন।

সুমুখীর স্বামীর নাম ভজহরি—তিনি নব্য বঙ্গ, এম এ, বি, এল—উকীল।

ঐ অনারারি পদে তিনি আজ কিছু কম একবৎসর প্রতিষ্ঠিত। ভজহরি এদিকে ছেলে ভাল; কিন্তু এত লেখা পড়া শিখিয়াও যে তাহার কথার ঠিক থাকে না, ইহাই বড়

পরিতাপের বিষয়। যখন তিনি বিয়ে ক্লাশে পড়েন, তখন অবধি সুমুখীকে লোভ দেখাইতেন যে, বি, এ, পাস করিতে পারিলেই গহনা দিব। বি, এর, পর এম, এ—তখনও কিছু সুবিধা হইল না; তথাচ সেই মিথ্যাবাদী পুরুষ সরলা রমণীকে লোভ দেখাইতে ছাড়ে না—সুমুখীকে বলিলেন—“প্রিয়ে! নিশ্চয় বলিতেছি, যে দিন উকীল হইব, তার পর দিন এক সুট গহনা দিব”। তার পর কালক্রমে উকীল হইলেন, সুমুখীর আশা—পথ বিকশিত হইয়া উঠিল। ভজহরি বাবু প্রথমে যে দিন বাহালি পরওয়ানা হাতে করিয়া শাম্‌লা আঁটিয়া কাছারী যাইবার উৎযোগ করিতেছেন, তাঁহারই কথামত সেই দিন সুমুখী এক খানি গহনার ফর্দ্দ তাঁহার হাতে দিলেন। স্বামী হৃষ্টচিত্তে স্ত্রীর হাত হইতে গহনার ফর্দ্দ গ্রহণ করিলেন। স্ত্রী তখন আহ্লাদে ডগমগ হইয়া স্বামীকে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলেন। কিন্তু এঘটনার পর এক-বৎসর অতীত হইতে চলিল, ভজহরি এমনি পাষণ্ড, গহনা দূরে যাউক, ফর্দ্দ খানি পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিয়াছেন। (বলেন হারাইয়া গিয়াছে) ছি! ভজহরি! এই কি তোমার ধর্ম্ম? তার পর সুমুখীর সয়ের কন্যার বিবাহ স্থির হইল;—ভজহরি ফের বলিলেন,—বিবাহের পূর্ব্বে চিক্, চুড়ি, মাথার ফুল—এই তিনটি নূতন গহনা দিবই দিব। আজ সেই বিবাহের দিন। এখনও গহনা পান নাই। সুমুখী স্বামীর নামে, ফৌজদারী আদালতে বঞ্চনা, বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য অভিযোগ করিতে পারেন না? আর মন কষ্টের ও মানহানির ক্ষতি পূরণের জন্য দেওয়ানি আদালতে আর এক নম্বর নালিশ করিতে পারেন না?

সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে; সুমুখী গহনা পান নাই, নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইতে পারেন নাই; কিন্তু সয়ের মেয়ের বিবাহে না গেলেও নহে—কিন্তু কি করিয়াই বা যান, নূতন গহনা নাই—সব পুরাতন, তাঁহার বিবাহ কালের গহনা। মহা বিপদ! তবে এখনও এক আশা আছে, স্বামী অদ্য কাছারী না গিয়া গহনার অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন।

ওদিকে ভজহরির আজ দশ দিন উদরে অন্ন নাই—মুখ পাণ্ডুবর্ণ, কাছারী যান নাম মাত্র; বেচারা মারা পড়িবার উপক্রম হইল—ঘরের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, কাছারীর অবস্থাও তদ্রূপ। যাহা হউক, সেই দিন কি উপায়ে মাতৃ-পিতৃদায় অপেক্ষা গুরুতর—এ পত্নীদায় হইতে উদ্ধার হইবেন, ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। ঠিক করিলেন, বাস্তুভিটা বন্ধক দিলে এ কার্য্য যদি উদ্ধার হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু কেমন কপালের দোষ, তথাচ কোথাও টাকার যোগাড় হইল না। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল, কিন্তু তিনি ঘরে আসিতে পারেন না, বাড়ীর দিকে আর পা উঠেনা—গহনা বিনা কি বলিয়া ঘরে ঢুকিবেন ভাবিলেন, আর ঘরে যাইব না, বিবাগী হইব—এই বলিয়া আদালতের নিকটবর্ত্তী বাঁধা ঘাটের চাঁদনীতে বসিলেন।

এখানে স্ত্রীর মন বড় চঞ্চল হইয়াছে, স্বামী কখন্ আসেন কখন্ আসেন্, এই চিন্তায় পথ পানে চাহিয়া আছেন। কিন্তু রাত্রি ৮টা বাজিল, তখনও স্বামীর দেখা নাই। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন, স্বামীর সকল জুয়াচুরি, তখন সুমুখী উন্নতফণা সর্পিণীর ন্যায় বিষম গর্জ্জাইতে লাগিলেন।

এখানে ভজহরি বাবুর মহা ভজকট—এ রাত্রে কোথায়ই

বা যাই, একে অসুস্থ শরীর, মাথার ব্যারাম উপস্থিত—তাহার পর আজ কয়েক দিন অনাহার। আজ ঘরে যাই, দু এক দিনের মধ্যে সুবিধা করিয়া স্থানান্তরে নিশ্চয়ই যাইব। তখন সেই সংসার-তরীর গুণটানা মাজি ভজহরি বাবু গুটি গুটি গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং শুষ্কমুখে সুমুখীর কাছে উপস্থিত হইলেন। সুমুখী মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন, গহনা আইসে নাই, তখন বলিলেন, আমার মরণই ভাল, মনুষ্যজন্ম জন্মে লোক লৌকতা কিছুই হলোনা, পোড়া পেটে কেবল খেলে কি হবে—সেখানে দশ বাড়ীর মেয়ে একত্র হয়েছে, আমি কেবল যেতে পারিলাম না—নেহাতই কাঙ্গালের ঘরের মেয়ে নইত আমার মরণই ভাল। চুপ করে রহিলে কেন—গহনা এনে থাকত বল।

ভজহরি তখনও নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্ত্রী তখন একটু তর্জ্জন করিয়া বলিলেন "ওকি? চুপ করে থেকে কি হচ্চে? গহনা না এনে থাক, তাই বল বুঝি। ভজহরি অতি ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমাকে আর তুমি কিছু বলো না—কেবল ঐ চাকু ছুরী খানিকে আমার গলায় দাও, আমি সকল জ্বালা এড়াই'। স্ত্রী তখন গলা পঞ্চমে চড়াইয়াছিলেন; এককালে যেন পঞ্চাশ খানি কাঁসোর বাজিয়া উঠিল, বলিলেন—"আমি এখনি গলায় দড়ী দিয়ে মরিব, ঐ ছুরী আগে আমার গলায় দিব—আমি মর্‌বো, মর্‌বো, মর্‌বো, এত অপমান লাঞ্ছনা—ধন্যি আমি, তাই এখনও বেঁচে আঁছি—আমার অদৃষ্টে এই ছিল"। শব্দ শুনিয়া প্রতিবেশি-গণ ভাবিতে লাগিল, ভজহরির বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে নাকি? তখন ভজহরি অতি কাতর হইয়া জোড় হাতে বলি-

লেন—"আমি জানি না, তুমি আমায় এ যাত্রা ক্ষমা কর, একটু আস্তে কথা কও, লোকে শুনিলে বলিবে কি?"—জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত উথলিয়া পড়িল। কাল ভৈরবরূপিনী সুমুখী যেন জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। তখন রুদ্র ভজহরি দ্রুতবেগে উর্দ্ধশ্বাসে বাটী হইতে পলায়ন করিলেন।

রমণীর মর্ম্মকথা।

সভ্য পুরুষমণ্ডলী মাঝে, একটা হাহারব উঠিয়াছে, স্ত্রীলোক বড় অলঙ্কারপ্রিয়। গহনার দেহি দেহি ডাকে পুরুষের কাণ গেল, মান গেল, প্রাণ গেল। যেন পাপিনী রমণী ভৈরবী সাজিয়া গহনার জন্য, ভাল-মানুষের ছেলের চক্ষে সদাই ত্রিশূল বিদ্ধ করিতেছে! অনেক পুরুষের বিশ্বাস, বুঝি রমণীকূলের এই পাপেই আকাশে জল নাই, গরুর বাঁটে দুধ নাই, গাছে আম নাই; বুঝি এই পাপেই ইলবার্ট বিল পাস হইল না, লালমোহনের বিলাত যাওয়ার ফল ফলিল না, কলপে পাকা চুল সাদা হইল না, পাউডারে শ্যাম অঙ্গ সুন্দর হইল না। এ অমঙ্গলের আকর নারীজাতিটা দেশ থেকে উঠিয়া না গেলে, দেশের আর শ্রেয়ঃ নাই।

রমণী চিরকালই পুরুষের দাসী; যেন স্বামী সেবা করিতে করিতেই সহধর্ম্মিণীর শরীর ক্ষয় হয়, যেন পতির চরণ প্রান্তে মাথা রাখিয়া স্ত্রী ইহসংসার ত্যাগ করে; ভগবান আমাদের অদৃষ্টে ইহাই করুন। ইহাই আমাদের ধর্ম্ম অর্থ, কাম মোক্ষ। তোমরা বলবান্ পুরুষ—রমণীর আশ্রয়—পঙ্কজের ভাস্কর—কুমুদিনীর

লে—তোমাদের কি ধর্ম্ম তা জানি না; তবে এই মাত্র বুঝিয়াছি, স্ত্রীলোককে গালি দেওয়া তোমাদের একটা ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। । নব ধর্ম্ম তোমাদেরই বজায় থাক, আমরা তাহার অংশ-ভাগিনী হইতে চাহি না, তবে পতিব্রতা সতীসাধ্বী গৃহিনী-গকে বৃথা গালি দিলে, গৃহের পাছে অমঙ্গল হয়, ইহাতেই অন্তর কাঁদিয়া উঠে!

আমরা গহনা চাই বটে, গহনার জন্য কখন কখন বিরক্তও করি বটে, কিন্তু সে গহনা লইয়া কি আমাদের স্বর্গদ্বারের সিঁড়ি প্রস্তুত হয়? পিতার ভরণ পোষণের জন্য তাহা কি বাপের বাড়ী পাঠাই? না; নিজের সোণার চন্দ্রহার ভাঙ্গিয়া ভায়ের গলার হার গড়াইয়া দি? যাহা দাও, সবই ত তোমার থাকে?

আমরা কেবল ভাণ্ডারী; যত্ন করিয়া রাখি, ধূলা ঝাড়ি, বাক্স সাজাই; আর অসময়ে আবশ্যক হইলে তোমার ধন তোমাকেই দি। তবে অপরাধের মধ্যে আমরা বিনা মাহিনায় ভাণ্ডারী—কেবল চরণধূলার ভিখারী। আমরা বুঝি, গহনা পরিলে স্ত্রীলোক চতুর্ভুজ হয় না, রং ফরসা হয় না, শশধরলাঞ্ছন হয় না, গমন গজেন্দ্রকে লজ্জা দেয় না; আমরা বুঝি, গহনা হলোয়ের বটিকা নহে যে, ইহাতে শরীরের সর্ব্বরোগ সভয়ে পলায়ন করিবে; গাজীপুরী গোলাপ জল নহে যে, মস্তিষ্ক শীতল থাকিবে; বড়বাজারের ম্রাতাবি সন্দেশ নহে যে, সরস রসনা তৃপ্তি লাভ করিবে,—এত বুঝি, তবুও গহনা গহনা করি কেন?—গহনা অসময়ের সম্পত্তি, দুর্ভিক্ষের অন্ন, দেন-ভিক্রীর নগদ টাকা; যখন তুমি কন্যাদায় গ্রস্ত, পণের টাকা জুটাইতে পার না, তখন কে গহনা বন্ধক দিয়া টাকার সংকুলান করে? যখন

ছেলেটীর ডিপজীটের টাকা অভাবে এণ্টেন্স-পরীক্ষা দেওয়া হয় না, তখন কে পায়ের মল বাঁধা দিয়া দশটাকা ধার আনিয়া দেয়? যখন তোমার পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তুমি বলিয়াছিলে, "প্রিয়ে, পাঁচশত ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইলে আমার মান সম্ভ্রম বজায় থাকে না, আমার হাতে একটি পয়সা নাই,—কি উপায় করি বল দেখি?" তখন কে দ্বিরুক্তি না করিয়া অমনি হাতের কঙ্কণ, গলার সাতনর, কাঁকালের চন্দ্রহার খুলিয়া দিল? স্ত্রীলোক রাক্ষসী নহে যে, গহনা লইয়া গিলিয়া ফেলে, পরী নহে যে, গহনা লইয়া উড়িয়া পলায়;—তোমাদের প্র দত্ত ধন, তোমাদেরই থাকে,—তাহার জন্য এত গঞ্জনা,লাঞ্ছনা, অবমাননা কেন?

আর একটা কথা বলি। একথা বলিবার নহে—মুখে আনিলে, হৃদয়ে ভাবিলেও পাপ আছে—তবে তোমরা নাকি দারুণ স্বার্থ-অন্ধ, চোখে আঙ্গুল দিয়া না বুঝাইলে বুঝনা, তাই এ পাপিনীকে পাপ কথা পাপ মুখে বলিতে হইল। বল দেখি, আমরা যে তোমার আজীবন দাসীগিরি করি, তাহার কি কোন পুরস্কার নাই? তুমি প্রিয়তম, নয়টার সময়ে আফিস যাইবে, আমি প্রাতে উঠিয়া পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত প্রস্তুত করিয়া দিলাম; তুমি বৈকালে আসিয়া জল খাইবে, আমি লুচি মোহনভোগ করিয়া রাখিলাম; তোমার একটু সর্দ্দি করিয়াছে, আমি সারা-নিশি জাগিয়া তোমার পদতলে ফোমেণ্ট করিলাম; তুমি শীতে নিশীতে গরম জল না হইলে আঁচাইতে পার না, আমি গরম জলের ঘটি হাতে করিয়া তোমার সম্মুখে ধরিলাম। বল দেখি, কে এমন শরীর রক্ষা করিয়া হৃদয় প্রাণ সঁপিয়া তোমার মন বুঝিয়া, আজীবন এরূপ দাসীগিরি করিতে পারে? এ দাসীর যদি দুই টাকা করিয়াও মাসিক মাহিনা ধর, তবে পঞ্চাশ বৎসরে র

মায় শুদ অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা হইবে। তাই বলিতে হয়, খান কতক গহনা দিয়া এত খোঁটা দাও কেন? দিতে পারিবেনা, অক্ষম—তাহাই স্বীকার কর;—স্বীকার করিতে লজ্জা হয়, চুপ করিয়া থাক; দিব না—অথচ চক্ষু রাঙ্গাইব, পুরুষ জাতির ইহা কেমন নীতি—এ অধমা নারী, তাহা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কিন্তু পুরুষ-সিংহের ঐ সুগভীর গর্জ্জন শুন—"কি বলিলি, নুনখায়িনী, অকৃতজ্ঞা,—আমার ঘরে থেকে আমার খেয়ে,—আমারই নিন্দা? রমণীর জন্য পুরুষ কত কষ্ট না সহিতেছে? প্রতি রবিবারে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্ত্রীকে লেখা পড়া শেখায় কে? রমণীকুলের জ্ঞানোদয়ের জন্য চেষ্টা করে কে?" বোধোদয় পড়াও বটে, কিন্তু কেন, স্বার্থ কার? তুমি প্রাণপতি বিদেশে থাকিবে, আর আমি প্রত্যহ ডেলি নিউস চালাইব "হে প্রাণেশ্বর; হে প্রাণবল্লভ, হে জীবন আকাশের এক মাত্র চাঁদ, হে হৃদয়-সমুদ্রের একমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা, হে পক্ষীর মধ্যে গরুড়, হে অট্টালিকার মধ্যে মনুমেণ্ট, হে রামসেনা মধ্যে অঞ্জনানন্দবর্দ্ধন! একবার অধিনীর উপর করুণ কটাক্ষ পাত কর হে!"—তুমি বিদেশে বসিয়া এই সব পড়িয়া খুসী হইবে, আর মনে মনে বলিবে, "বাহবা কি বাহবা,—এমন শিক্ষিতা পতিব্রতা কুরঙ্গনয়নী আমি কখন দেখি নাই।" এই জন্যই ত বোধোদয় পড়াও—না আর কিছু আছে?

কোন কোন ভাবুক পুরুষ, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন, "হায় হায়! কি ছিল, কি হইল! রমণীকুলের দশা কেন এমন হইল? যাঁহারা গৃহদেবতা ছিলেন, তাঁহারা এখন অপ্সরা হইয়াছেন, কল্যাণী রঙ্গিনী হইয়াছেন, গৃহের স্তম্ভ, দেয়ালের

পেণ্টিং হইয়াছেন, সহধর্ম্মিণী খ্যামটাওয়ালী হইয়াছেন।” আমরাত মন্দই—চির অপরাধ-ময়ী! কিন্তু তোমারা কি ছিলে, কি হইয়াছ ভাব দেখি? সে সোণার সংসার আর নাই, এখন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—অধিক কি, পিতা পুত্র একত্র থাকিতে চাহেনা,—মাতা বাপের পরিবার হইয়াছে। তখন এক ভাই বিদেশে চাকুরি করিত, অপর ভাই গৃহে চাসবাসে মন দিত, পিতা গৃহের ব্যবস্থাকর্ত্তা ছিলেন। এরূপে একত্রে এক অন্নে থাকিয়া ক্রিয়াকলাপ,দোল দুর্গোৎসব,শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, - একটু অধিক সঞ্চয় হইলে অতিথিশালা স্থাপন, বঙ্গীয় গৃহস্থ গৃহে এসকল সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইত। এখন যেন পক্ষীর জাত হইতেছে, ডানা বাহির হইলেই উড়িয়া পলাও, আর বুলি ধর “আমি কার, কে আমার কারে ভাবিরে আপন”। তখন সুব্রাহ্মণ আনাইয়া কথকতা দিয়া গৃহ পবিত্র করিতে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, উচ্চ, নীচ, পণ্ডিত, মূর্খ সকলে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ ভরিয়া সে হরিগুণ গান, সে সুধাময় সঙ্গীত শ্রবণ করিত; এখন সেই পবিত্র বঙ্গ-গৃহে বারবিলাসিনীর বিভৎস নাচ না দেখিলে, খ্যাম্‌টেশ্বরীর “বসন্তে ফুট্‌লে,কুসুম ফুল” গান না শুনিলে, তোমার তাপিত প্রাণ শীতল হয় না। তখন হৃদয়ভরা প্রেমে, বুক ভরা ভাবে, মুখভরা মধুময়ী কথায় সদালাপ করিতে,—বোধ হইত, বুঝি ইহাতেই স্বর্গ, বুঝি ইহাই মুক্তি, ইহাই বুঝি চক্ষের কৌস্তভ-মণি, কণ্ঠের কহিনুর, নয়নের তারা, দেহের প্রাণবায়ু; আর এখন তোমাদের প্রেমের পরিবর্ত্তে স্বার্থ, ভালবাসার পরিবর্ত্তে মনরাখা মিষ্টি ছুরী, সদালাপের পরিবর্ত্তে খল খল হাসি;—তাই বুঝি এখন আর পত্নী-বিয়োগে অশৌচ কাল শেষ হইবার অপেক্ষা করিতে পার

না,—দ্বিতীয় দিনে নূতন বেশে নূতন হাসি হাসিয়া নূতন "কনে" দেখিতে যাও।

পুরুষ জাতির অধিক নিন্দা করিব না, এইমাত্র বলিব,—যিনি রামায়ণের রাম ছিলেন, তিনি এখন লণ্ডন রহস্যের যুবরাজ হইয়াছেন,—ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির, ননিচোরা কেঁড়েভাঙ্গা, কদম-তলার কৃষ্ণ হইয়াছেন; ভগবৎগীতা বিদ্যাসুন্দর হইয়াছে; চন্দন-বৃক্ষ বাবলা গাছ হইয়াছে। তুমি আগে ছিলে, গঙ্গা জলে চিনি, এখন হইয়াছ ব্রাণ্ডিজলে লেমনেড; আগে ছিলে তানসানের সঙ্গীত, এখন হইয়াছ নিধুর টপ্পা; খাঁটি সোণা পিতল হইয়াছে—দেবতা দৈত্য হইয়াছে।

গদাধর-চরিত্র!

(আরম্ভ)

গদাধরের গ্রামে বড় পসার, পাড়ায় ভারি মান্য, ঘরে অতিশয় আদর। ছেলে ভাল হইলেই এই রকম ঘটে; জিনি-য়স-আগুণ কবে লুকান থাকে? গদাধর যখন নবম বর্ষীয় বালক তখন হইতেই রাজনীতির গূঢ় রস বুঝিতে আরম্ভ করেন,—যেন বালক ধ্রুব ঐশ্বরিক ভাবে তন্ময় হইলেন। বঙ্গীয় রাজনীতির তেজ বড় প্রবল, যেন মরা গঙ্গায় ভরা বাণ,—গদাই আর কাকে মানেন না, বাপের কথা শুনেন না, মাষ্টারকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া উঠেন। লোকে ভাবিল, ছেলের ভারি ইস্পিরিট।

গদাধরের পল্লীগ্রামে বাস। বাপ নিরীহ মানুষ—চাসবাস করে, খায় দায় থাকে। গ্রামে একটি মাইনর স্কুল ছিল। গদাই

দুই বার মাইনর পরীক্ষায় ফেল হইয়া বলিলেন, এ স্কুল কিছু নয়, মাষ্টার কিছু জানে না ; গ্রামে, গঙ্গার এ পারে আর পড়িব না— সহরের স্কুলে না পড়িলে বিদ্যা হয় না, উন্নতি হয় না। বুড়ো বাপ কি করিবে ? সেকেলে মানুষ ; পুত্রের কথাতে বুঝিল, "হতেও পারে, সহরে না থাকিলে বড়লোক হয় না"। বৃদ্ধের পূর্ব্ব-সঞ্চিত যা ধন ছিল—শরীরের রক্ত জল করিয়া যে কিছু রোজ-গার করিয়াছিল, তাহাই খরচ করিয়া পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইল। পুত্র শুভ দিনে বাঁকা সীঁথি কাটিয়া, কালা পেড়ে কোচান ধুতি পরিয়া, আতরের গন্ধে ভুর হইয়া, বিদ্যা শিক্ষার্থ কলিকাতা যাত্রা করিলেন, মনে হইল যেন একটি মল্লিকা ফুলের তোড়া চলিয়া যাইতেছে ; যেন বর বিবাহ বাসরে অগ্রসর হইতেছেন, অথবা যেন ফরেষডাঙ্গার বাবু কার্ত্তিক-বাহন ছাড়িয়া পদাচরণ করিতেছেন। গদাধর অতি পরিপক্ক বয়-সেই স্বগ্রাম হইতে প্রায় সকল নব প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা মনোনীত হইয়াছিলেন ; আর "একটা ছাগলের তিনটা লেজ," "বিড়ালে মহিষ প্রসব করিয়াছে"— এই রূপ অদ্ভুত সংবাদ লিখিয়া সংবাদপত্রকে এবং জগৎকে উপকৃত করিতেন। এখন সহরে আসিয়া সংবাদপত্র ছাড়িয়া ম্যেগাজিন ধরিলেন। কারণ গদাই সতত বলিতেন, সামান্য বিষয় আর তাঁহার কলমে আইসে না—তাঁহার মস্তিষ্ক কেমন খারাপ হইয়াছে যে, ছোট বিষয়ে আর তাঁহার নজর পড়ে না, কাজেই তাঁহাকে ম্যাগেজিনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। সে যা হোক, এ দিকে আবার পোড়া শিক্ষকের দোষে, পাপ স্কুলের দোষে গদাই সহরেও পুনঃ পুনঃ এন্ট্রেন্সে ফেল হইতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃত তেজ কিছুতেই কমেনা,

বাপকে লিখিলেন, প্রিয় পিতঃ পাস ফেল কেবল হাওয়ার গতি—ইহাতে বিদ্যার কিছু মাত্র পরিমাণ বুঝা যায় না—পিতঃ আমি যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহাতে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ইহকাল পরকালে পরম সুখে বাবুগিরি করিয়া কাল কাটাইতে পারিব।

ক্রমে বড় কঠিন কাল আসিল। পিতার ধূলি গুঁড়ি চক্রাকার হইল,—ছেলেকে আর বাসাখরচ পাঠাইতে পারিলেন না। গদাই তখন সংসার আঁধার দেখিলেন; অন্ন চিন্তা চমৎকার হইল। আশা বৃহৎ—ডেপুটীগিরির কম চাকুরী লইবেন না, এইরূপ আড়ম্বর করিতেন। কিন্তু ক্রমে বুঝিলেন, আমি কোন্ কীটানুকীট—যেখানে বড় বড় ইন্দ্রপাত হইতেছে, সে স্থলে গদাইয়ের গলা-ধাক্কা ব্যতীত অপর পুরস্কার কি হইবে? সকল আশা ভরসা 'উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে' হইল; গদাই ক্রমে শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, কি করি? কিন্তু জিনিয়স-গদাইয়ের অধিক ক্ষণ ভাবিতে হইল না।—"সংবাদপত্রের এডিটর হই, কিম্বা দেশহিতৈষী হই" এই দুইটীর মধ্যে কোন্ পদটী গ্রহণ করিবেন, তাহারই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেশ-হিতৈষিতার প্রধান অস্ত্র বক্তৃতা, তাহাতে গদাই কম নহেন, তবে বক্তৃতায় ত পয়সা হয় না—এই ভাবনায় অস্থির হইলেন; কিন্তু তখনই প্রতিভা বলে বুঝিলেন, বুদ্ধি থাকিলে কি না হয়? বুদ্ধি থাকিলে সাগরে তরী চলে, আকাশে বেলুন উঠে, পাথারে পদ্ম ফুটে, দুধে গোয়ালা জল ঢালে, চোরে চুরী করে। আমি এত লেখা পড়া শিখিয়া কি কেবল শুধু হাতে ফিরিব? গদাধর সেই দিন হইতে দেশ ভক্ত হইলেন, মুখে আর কোন কথা নাই, কেবল বলিতেছেন,

মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি ;
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি !
সত্বরে কামস্কট্‌কা রেলপথ করি,
ভাসিব আনন্দে ভারতে উদ্ধারি।

---

(২)

গদাধরের মনে মনে ধারণা, তিনি বড় সুপুরুষ। ভাবিতেন, এমন সুন্দর রঙ আর কোথাও নাই ; হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, মিত্রদের বড় বাবু অপেক্ষা তিনি চারি গুণ ফরশা, ঘোষেদের মেজ বউ অপেক্ষা সাড়ে তিন গুণ এবং ঠাকুর বাড়ীর রঙ অপেক্ষা দ্বিগুণ—রঙে ইহ জগতে দ্বিগুণের নীচে তিনি কখন ও হইলেন না। গদাইয়ের ইহসংসারে একটা বিশেষ কার্য্য, দর্পণে মুখ দেখা। সময় নাই, অসময় নাই, সুবিধা পাইলেই আয়না লইয়া অমনি মুখ দেখিতেছেন—সম্মুখে আয়না খানি রাখিয়া কখন চোক বুজিতেছেন, কখন দাঁত বাহির করিতেছেন, কখন বা রুমাল দিয়া চোখের কোণ্‌ মুছিতেছেন ; আর ভাবিতেছেন আমিই বুঝি স্বয়ং রতিপতি কন্দর্প—ভুলক্রমে মানব গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

গদাই কেন যে এমন করিতেন, তাহা তিনিই জানেন, তাঁর মন জানে, আর অন্তর্যামী ভগবানই জানেন ; লোকে কিন্তু চর্ম্মচক্ষে দেখিত, গদাই একটি মেটে রঙের পুরুষ, চোক দুটি কোটরে, লম্বা—গায়ে মাংস নাই। তবে লোকের ভ্রান্ত চক্ষু দূষিত হইতে পারে।

গদাই একটি নিখুঁত পুরুষ ; গম্ভীর ; ন্যায়ের মস্তকে কখন পদাঘাত করেন না ; সুরাপায়ী দেখিলে শিহরিয়া

উঠেন, লোকের দুঃখ দেখিলে কাঁদেন। তবে যদি কেহ বলি "গদাই! তোমার বয়স ৩২ বৎসর—তুমি কি আজকের লোক" গদাই অমনি ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইতেন,—বলিতে আমার অপেক্ষা রামহরি দশ বৎসরের বড়, তার আজও বিবা হইল না। তোমরা বড় খারাপ লোক। বয়স লইয়া লোকে সহিত গদাইয়ের সচরাচর বচসা হইত। গদাইকে অশ্রাব কটূক্তি কর, দুই ঘা মার—শিষ্ট শান্ত গদাই সকলই নীরবে সহিতে পারেন, কিন্তু কুড়ির বেশী বয়স বলিলে গদাই ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিতেন। ঈশ্বরের কেমন সৃষ্টি জানি না, কিন্তু, গদাই-চরিত্র এই রূপই ছিল।

এক দিন প্রাতঃকালে সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া গদাই নিবিষ্ট-চিত্তে কি গভীর ভাব ভাবিতেছেন, তাহা কেহ জানে না; মলয়-মরু আন্দোলিত নলিনীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে দুলিতেছেন, আর অস্ফুট কণ্ঠস্বরে, বলিতেছেন, "সব ঠিক্, কেবল চীনে একজন দূত পাঠাইলেই হয়—উপযুক্ত পাত্র কে? পাত্রের মধ্যেত আমি আর মিষ্টার গোবর্দ্ধন। কিন্তু আমরা গেলে চলে কৈ? তবে কি কামস্কটকা রেল পথ হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে"? গদাই ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে, ভাব-সাগরে ডুবিয়া গেলেন; ক্রমে একটু উঁচু স্বরে বলিতে লাগিলেন;—

একা আমি এসংসারে কোন্ দিক্ রাখি,
দুই হাত দুই পদ, দুই নাসা পুট—
দুটীর অধিক মোর নাহি কর্ণ ছিদ্র;
হায়রে নাহিক জিহ্বা একের অধিক,—
সামান্য সম্বলে বল কেমনে পথিব
কামস্কাট্কা-ভূমি; হায় মোর কি যন্ত্রণা;

কেন না হইল মোর দুইটি রসনা,
চারি চক্ষু চারি হস্ত, চারিটি চরণ।
তা হলে কি আজ আমি ভাবিতাম এত ?
দুই চোক পাঠাইতাম চীন উপকূলে,
একটি রসনা যেত লয়ে দুটী হাত
(বক্তৃতাকালে নাড়িবার হেতু চীন দেশে)
এতক্ষণ চীনরাজ কাঁপিত সভয়ে—
পায়ে ধরি ভাব করি দিত ভূমি ছাড়ি ;
চলিত বাষ্পীয় যান গভীর গর্জ্জনে
ঘোর রবে ঘর্ঘরিয়া ঘুরিয়া উঠিত
গিরিশৃঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে মাতঙ্গ যেমতি
ধায় মাতঙ্গিনী পিছে পর্ব্বত উপরি।
কিন্তু একা আমি ; যোড়া যোড়া নাই বস্তু
কি করিতে পারি ? ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে
অশি করি করে উপাড়িয়া ডান চক্ষু,
চিরিয়া রসনা, ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু
ফেলি চৈনিক প্রাচীরে,

এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া পশ্চাৎ হইতে গদাইয়ের চক্ষু টিপিয়া ধরিল ; গদাই বলিলেন,

"কে তুমি হে ? মিষ্টার মিত্রজ নাকি ?
চক্ষু চাপি কিবা ফল ছাড় দুনয়ন ;—
জ্ঞান চক্ষে ধুলি দেয় কাহার শকতি ?
পার্থিব-নয়ন ঢাকি মোরে কি ভুলাবে ?
চক্ষু বুজি সব দেখি, আমি গদাধর !

তখনও তিনি চক্ষু ছাড়িলেন না—গদাই আবার বলিলেন,—

চক্ষু ছাড় গোবর্দ্ধন মিত্রজ নন্দন
নয়ন-রতন আজ বড় মূল্যবান ;
ডান চক্ষু যাবে আজ চীনের মুল্লুকে,
বাম আঁখি রবে গৃহে, গৃহ করি আলো।

সেই লোকটি তখন চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল ; গদাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, একি ?

নিবাস কোথায় তব ঘর কোন্ দেশে ?
কভু তুমি নহ বঙ্গে মিষ্টার গোবর ?
বঙ্গ ভূমি জন্ম ভূমি নহেরে তোমার ?
'জাতীয় লক্ষণ নাই তোমার শরীরে !
হ্যাট, কোট কৈ তব ? গলায় কলার কৈ ;
একি বস্ত্র পরিধান ?—লাজে মরি দেখে
ফিঙফিঙে কাণি—নীচে তার কাল ডোরা,
উপরে উলঙ্গ অঙ্গ—রঙ্গ ভঙ্গ দেখি
শিহরে আতঙ্কে অঙ্গ মোরে ; হায় বিধি
কি মাটিতে গড়েছিলে এ নর-মূরতি ?

লোকটির নাম হরিদাস ঘোষ, গদাধরের গ্রামবাসী। বাল্য কালে উভয়ে গ্রাম্য স্কুলে পড়েন। তবে পরস্পরে এক্ষণে পদের তারতম্য হইয়াছে, হরিদাস ৭০৲ টাকা মাহিনার কেরাণী, গদাধর এখন উচ্চে,—গিরি শৃঙ্গ অপেক্ষা অধিক উন্নতস্থলে—প্রায় স্বর্গের কোলে অবস্থিত। একবার ছাপা-খানা করিব বলিয়া গদাই হরিদাস বাবুর নিকট হইতে তিন শত টাকা কর্জ্জ করেন ; লোকে বল্লে সে টাকা মতিলাল সাহা ডিক্রী জারি করিয়া লয়, গদাই বলেন, "কামস্কাটকা রেল-পথে ব্যয় হইয়াছে।" সে প্রায় এক বৎসরের কথা।

হরিদাস মাসে এক খানি পত্র লিখিয়াও সে টাকা পান নাই—ভাল মানুষ হরিদাস কি করেন, শেষে স্বয়ং আসিয়া দেখা করিলেন। তিনি বড় আমোদপ্রিয় লোক। বহু দিনের পর. বালক-বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি গদাইয়ের চক্ষু টিপিয়া ধরেন; শেষে গদাইয়ের বিকৃত ভাব দেখিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া চক্ষু ছাড়িয়া দিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে হরিদাস বলিলেন, "ভাই গদাই একি? তোমার কি হইয়াছে? আমাকে কি সত্য সত্যই চিনিতে পারিতেছ না? তুমি বিকৃত ভাষায় ও সব কি বলিতেছ?"

উত্তরিল, গদাধর, ক্রোধে কম্প দেহ—
"কে তুমি হে কৃষ্ণকায়? ভোমরা ভরম
হয় দেখি তব দেহ; কুকণ্ঠে উগার
কেন কাল পেঁচা সম কিচিকিচে ধ্বনি;
(এবে) অনেক সঙ্গেতে আসে 'সখা সখা' বলি
আলাপিতে মোর সনে এ ঐশ্বর্য্য-কালে।
ভাই বল, খুড়া বল, বাবাইবা বল—
কিছুতেই গদাধর ভুলিবার নয়!
অধিক কি আর কথা আছে তোমা সনে।
শীঘ্র ছাড় মোর পাশ—বমি বাহিরিবে
দেখি তব কালো অঙ্গ; চামচিকা সম
দুর্গন্ধ গায়েতে তব—পালাও অসভ্য'
নহিলে পুলিশে দিয়া প্রহারিব তোরে।"

হরিদাস বাবুর এঁকে অনেক দিনের পাওনা আছে—তাহার উপর এইরূপ ব্যবহার, তিনি একটু জ্বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ গদাই তোমার আদি অন্তঃ, নাড়ী নক্ষত্র জানিতে আমার আর

কিছু বাকি নাই, টাকা ধার লইয়াছ, দাও; যারা তোমাকে জানে না, তাহাদের নিকট বক্তৃতা করিও, চক্ষু বুজিও—কামস্কাটকায় রেল পথ পাতিও। আমাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ না? আমাকে তোমার স্মরণ না থাকিতে পারে,—কিন্তু যে দিন রামমণি ময়রাণীর মোকদ্দমায় তোমাকে পুলিশে লইয়া যায়, সে দিন তোমাকে কে রক্ষা করিয়াছিল? যখন খাইতে পাইতে না, প্রত্যহ এক বেলা অন্ন জুটিত না; তখন কে টাকা দিয়াছিল? যখন দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডের টাকা উদরসাৎ করিলে, সে সময়ে তোমাকে কে বাঁচাইয়াছিল? এ সকল কথাও কি এখন মনে নাই? এখন তুমি বড় লোক হইয়াছ, সাহেব সাজিয়া থাক, কবিতা রচনা কর,—বড় লাটের লেভিতে যাও, বক্তৃতা দাও,—শেষে কামস্কাটকায় রেল পাতিতেছ,—আমাকে চিনিবে কেন? আমি কালো, অসভ্য, সন্দেহ নাই,—তবে যে তিন শত টাকা ছাপাখানা করিব বলিয়া লইয়া আসিয়া ছিলে, তাহা দিলেই ঘর যাই।

গদাই। শুন বন্ধু নিবেদন—ক্রোধ কর কেন?
মন মোর মজিয়াছে, ভারতের ভাবে
ভাই, বন্ধু, মাতা, পিতা মনে নাহি পড়ে,
মুখ দেখি আর কারো চিনিতে না পারি
তুমি হে পরমাত্মীয় বৈস মোর কাছে
ভাল কর্ম্ম দিব ভাই! কামস্কাটকার পথে।

হরিদাস বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ভণ্ডামি রাখ; সোজা কথা কও, নহিলে আমি চলিলাম"। গদাই তখন হরিদাসকে এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া গিয়া গোপনে কি বলিলেন।

তখন হরিদাস গদাইয়ের দলে ভর্ত্তি হইতে অনুরুদ্ধ হই-

লেন। হরিদাস বলিলেন, আমি খেতে না পাই তাও স্বীকার, তোমাদের সঙ্গে মিশিব না। এই কথা বলিয়া তিনি উৰ্দ্ধশ্বাসে পলাইলেন।

ছোক্‌রা বাবু।

ছোক্‌রাটী দশকৰ্ম্মান্বিত। সব জানেন, সব বুঝেন, সবেতেই আছেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, রাজনীতি, পবিত্র প্রণয়, পরোপকার—এ সমস্তই তাঁর একচেটে। যেমন ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট অনৰ্গল বক্তৃতা করিতে পারেন, গানবাজনাতেও তিনি সেইরূপ। গৃহস্থের খোলা উঠান দেখিলেই, তিনি ঠিক আঁচিয়া লয়েন—এখানে বক্তৃতা জমিবে কিনা, এখানে পাঁচ শত লোকের সমাবেশ হয় কি না, এখানে রমণীকুল চিকের আড়ালে থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে পাইবেন কি না? গোল দীঘি, লাল দীঘি, হেদো, বিডন উদ্যান, জলের কলের মাঠ—তাঁহার কণ্ঠধ্বনিতে বহুবার প্রতিধ্বনিত। এদিকে ত এই; ওদিকে ঝিঁঝিঁট, খাম্বাজ, বসন্তবাহার, ললিতবিভাস, ইমন, পুরুবি—প্রায় সমস্ত সুরই তিনি ভাঁজিতে পারেন। লোকে ভাবে, কালেজের এত পড়া পড়ে, ছোক্‌রা বাবু এত গান শিখিলেন কেমন করে? হারমোনিয়মেও তাঁর দখল কম নহে। পাড়ার চতুৰ্দ্দশবর্ষীয়া একটী অতি শিশুবালিকাকে তিনি মধ্যে দিনকতক হারমোনিয়ম শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার বাজনাবিদ্যার উৎকৃষ্ট পরিচয়। ছবি আঁকা, উলবোনা, ফুল-তোলা,—এসবেও তিনি পেছপাও নন। ধরাধামে এমন কোন

কাজ দেখি না, যাহাতে তিনি অগ্রগামী নহেন। সভায় স্থির হইল, অদ্য হইতে বালকগণের ধূমপান ও পান খাওয়া নিষেধ। শপথ-পত্রে তিনি সর্ব্বাগ্রে সই করিলেন। শিমলা পাহাড় হইতে রীপণ হাবড়া ষ্টেশনে নামিলেন, তিনি রীপণের সম্মুখে সর্ব্ব প্রথমে দণ্ডায়মান। ধ্বজা ধরিয়া ভারত উদ্ধারের জন্য চাঁদা তুলিবার দরকার, তিনি কোমরে চাদর জড়াইয়া, চাঁদার খাতা বগলে করিয়া অলিগলি ঘুরিতেছেন। আর, এই বয়সে ছোক্‌রার প্রেমবিষয়িণী অভিজ্ঞতারই বা দৌড় কত? হৃদয়টা গ'লেই আছে! প্রাণ পাখীত উড়েই আছে! মানস-সরোবরে পদ্মফুলত ফুটেই আছে! আড়-নয়নে চাহনিত অনবরত বাকাই আছে! গোধূলি-লগ্নে ছাদে উঠিয়া একদৃষ্টে তীর্থদর্শনত আছেই আছে! এক জন বন্ধু একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসেন, "ওহে ভাই! তুমি এ ভর সন্ধ্যা বেলা, চোখ কপালে তুলে, রোজ রোজ একদৃষ্টে ঠায় কি চেয়ে দেখ বল দেখি? চোখ ক্ষরে যাবে যে!" ছোক্‌রা বাবু তখন এক মহা বিকট ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিলেন "কি কহিলে, অবোধ? আমি আকাশ-পটে অঙ্কিত জ্যোতির্ষিক পদার্থ দেখিতেছি; গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য্যের অস্ত-গমন, চন্দ্রের প্রস্ফুটন, নক্ষত্ররাজির সুশোভন অনিমিষ লোচনে হেরিতেছি,—

হে নভোমণ্ডল বল স্বরূপ,
কে দিল তোমায় এরূপ রূপ?

জ্যোতিষজ্ঞানের জন্য চক্ষু ক্ষরে, ক্ষরুক। রামচন্দ্র সীতার উদ্ধারের জন্য ভগবতীকে চোখ উপড়াইয়া দিতে গিয়াছিলেন, আর আমি এ সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্য, জ্যোতিষের উদ্ধারের জন্য, আমার দুইটী চক্ষুই কি দিতে পারিব না?"

বন্ধু। আকাশের শোভা দেখ্‌তে হলে, চোখ ত উপর পানেই থাকে। তোমার টেড়্‌চা চোখ বাঁকা-রেখার নীচে পানে চায় চেয়ে আছে কেন? জ্যোতিষ কি ছাদের উপর? চন্দ্র সূর্য্য কি জানালায় উঠে?

ছোক্‌রা। ছি! তুমি বিজ্ঞান বুঝনা!—তোমার শিখিতে এখনও ঢের বাকি। তোমার সঙ্গে আমি কথা কহিতে চাহি না।

তার পর হইতে ছোক্‌রা বাবুর সহিত তাঁহার বন্ধুর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইল।

ছোক্‌রা বাবু সর্ব্ব গুণের গুণমণি,—কেবল "এল এ" ফেল। বিগত বৎসর এলে ফেল হইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংস-বাসনায় গুরুতর রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। কেহ বলিল, ডিরেক্টারের চাকুরি যাইবে; কেহ ভাবিল, পরীক্ষকগণ প্রাণে মরিবে; কেহ বুঝিল, সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ দ্বীপান্তরিত হইবে।—ক্যোশ্চেন-পেপার কল্ করিয়া তিনি মহা মহা মেমো-রিয়াল ড্রপ্ করিতে লাগিলেন। প্রথমে ছোট লাট, তার পর বড় লাটের কাছে দরখাস্ত গেল। তাহাতেও কিছু হইল না দেখিয়া তিনি বিলাতে জন্ ব্রাইটের নিকট সে আবেদন পাঠাইয়া দিলেন। এমন কি, এ বিষয়ে লড়িবার জন্য,—বিলাতে শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষকেও মোক্তারনামা দিবার কথা হয়। সেই আন্দোলনে পৃথিবী ভূমণ্ডলের ন্যায় টল্ টল্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ছোক্‌রা বাবু বলিতে লাগিলেন, ইংরাজী সাহিত্যে আমার ১১১ নম্বর নিশ্চয়ই পাইবার কথা,—সেই সাহিত্যেই আমাকে ফেল করিয়াছে! সাহিত্য আমার কেল্লা—সে কেল্লা দখল করে কে? নিশ্চয়ই আমার কাগজে নম্বর দিতে ভুলিয়াছে

প্রথমে নির্জ্জনে এরূপ চিন্তা, চিন্তার পর সখাগণ সমক্ষে ঐরূপ কথাবার্ত্তা, অবশেষ ঐ বিষয়ে টাউনহলে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্য বক্তৃতা! দেখিয়া শুনিয়া ছোক্‌রা বাবুর গুরুজী বলিলেন, "এই ছোক্‌রা কালে অদ্বিতীয় পুরুষ হইবে—ভবিষ্যতে আমার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবে।"

এল, এ, ফেল হইয়া আন্দোলনের পরই ছোক্‌রাটী নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বে বিবাহ করিলেন। বিবাহ করিয়াই অবধি প্রণয়-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। কনেটীত নয় বৎসরের বালিকা, এখনও ধূলাখেলা করে, দিনে তিনবার ভাত খায়; পরে তাহাকেই, বিবাহের এক সপ্তাহ পরে, তিনি এইরূপ পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন;—

"প্রাণপ্রতিমে,

তোমার অদর্শনে প্রাণ জ্বলি জ্বলি করিতেছে। বিচ্ছেদের আগুণ দাউ দাউ জ্বলিতেছে। তোমার সেই মুখখানি,—সেই পূর্ণিমার শশধরবিনিন্দিত সেই প্রেমপূর্ণ মুখখানি—আমি কেমন করিয়া ভুলিব? ইচ্ছা হয়, বোমবানে করিয়া, উড়িয়া গিয়া তোমায় একবার দেখিয়া আসি, তোমার সেই আধ-হাসি আধ-লজ্জাপূর্ণ বদনমণ্ডলে একটী পবিত্র চুম্বন রাখিয়া আসি, কিন্তু বুঝি বিধাতার সেরূপ অভিপ্রায় নহে, নহিলে তুমি এত দূরদেশে থাকিবে কেন? তবে প্রাণেশ্বরি! ইহাও জানিও, যে যার প্রিয় সে তাহার কখনই দূর নহে। আকাশের চাঁদ কোটী যোজন দূরে থাকিয়াও, হ্রদমধ্যস্থ কুমুদিনীর বন্ধু। সাত সমুদ্র তেরনদী দূরে থাকিয়াও ব্রাইট ভারত মাতার বন্ধু! হা প্রাণনায়িকে! শারদিন্দুনিভাননে! তুমি আমার দূর নও!—সম্মুখে বসিয়া সেইরূপ ভাবেই আমার হৃদয় মন পুলকিত করি-

তেছ! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি, আমি চুম্বন করিলাম! কিন্তু প্রিয়ধন! তুমি কৈ? তুমি লুকাইলে কেন? আমি চারিদিক আঁধার দেখিতেছি!

প্রাণপ্রেয়সি! গোলাপ নাম তোমাতেই যথার্থ খাটিয়াছে! কেমন গাল-ভরা নরম নাম! একবার নাম উচ্চারণ করিলেই মুখে রস আসে। ইচ্ছা হয়, নিভৃতে বসিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একান্তমনে কেবল গোলাপ, গোলাপ, গোলাপ নাম জপ করি —শেষে ঐ নামের সঙ্গে আমার পরমাত্মাকে মাখাচোখা করিয়া মিশাইয়া দি।

ফুলশয্যার রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কও নাই বটে, কিন্তু তখন একটি আধটা যে কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াছিলাম, তাহাতেই তাপিত প্রাণ শীতল হইয়াছিল, উষ্ণ মস্তিষ্কে বরফ-জল পড়িয়াছিল! আহা! সে কোমল কণ্ঠের কমনীয় ধ্বনি কিবা মনোহর,---ঠিক যেন বসন্তবাহার রাগিণীর রসময় সঙ্গীত! কি বলিব, প্রাণ-প্রিয়ে! প্রাণ যে পুড়ে গেল! আমি চাতক পক্ষীর ন্যায় আশা-বারির আশায় উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম। তুমি কি একখানি পত্র লিখিয়া আমার এ আগুণ নিবাইবে না? আমাকে প্রতিদিন পত্র লিখিবে বলিয়া বিরানব্বই খানি টিকিট-যুক্ত খাম এবং এক প্যাকেট ডাকের কাগজ পাঠাইলাম। খামে আমার ঠিকানা লিখিয়া দিলাম, তোমার কোমল হাতের কষ্ট করিয়া আর ঠিকানা লিখিতে হইবে না। অদ্য বিদায়! চলিলাম।

মনে-রেখো-ভুল না—

তোমারই শ্রীঅনঙ্গমোহন।

এই পত্র পাইয়া, সেই নয় বৎসরের কনেটী ভাল মন্দ কিছুই

বুঝিল না ;—কেবল ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া রহিল। ছোক্‌রা বাবু ওদিকে নববিবাহিতা সহধর্ম্মিণীকে প্রত্যহ পত্র লিখিতেন---ডেলিনিউস চালাইতে বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, এদিকে কনেটী ডেলিনিউসের কথা তিলার্দ্ধও মনোযোগে না করিয়া প্রত্যহ কেবল আপন মনে পুতুল খেলা করিতে লাগিলেন। ইহাতে ছোক্‌রা বাবুর প্রাণ বড়ই আনচান করিতে লাগিল,—ডেলি-নিউসের বদলে, প্রাণাধিকার একখানি সপ্তাহিক পত্রও পাইলেন না। ছোক্‌রা বাবু আবার স্ত্রীকে পত্র লিখিবার জন্য লেখনী ধরিলেন ; আমরা অদ্য আপাততঃ কলম ছাড়িয়া বিদায় লইলাম।

হটাৎবাবু।

১ম।

দেখিতে দেখিতে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হইল। হাতে কলমে, জিহ্বার সাহায্যে—সৎ অসৎ কর্ম্ম করিয়া ভাল মানুষি জুয়াচুরি করিয়া, অনেক টাকা রোজগার হইল। বাল্যকালের কেবলা নাম ক্যাবলচন্দ্র বাবু নাম হইল। ধনের মাহাত্ম্য, ব্যবহারের মাহাত্ম্য, দুষ্কর্ম্মের মাহাত্ম্য—যখন এই তিন মহা মহা মাহাত্ম্য—এ্যহস্পর্শে একত্র হইয়াছে, তখন তাঁহাকে পাড়ার মধ্যে, নগরের মধ্যে কেনই না বা প্রকৃত "বাবু" অভিধানে অলঙ্কৃত করা হইবে ?

একজন প্রতিবেশী বৃদ্ধ "ভট্টাচার্য্য" লোক জনের সাক্ষাতে

প্রায়ই বলিয়া বেড়ান—"নির্ধনের" ধন হইলে, সে প্রায়ই ধরাকে সরা খানা দেখে,—কিন্তু আমাদের হরিদাস ভায়ার পৌত্র (অর্থাৎ আমাদের নায়ক) আজি কালি ধরাকে কটরা খানি অপেক্ষাও ছোট দেখিতেছেন। ওর বাপ দূর হইতে দেখিলে দৌড়িয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লয়; ও ছোঁড়া এখন চোখোচোখি হইলেও কথা কয় না, গাড়ি করে বুক ফুলিয়ে যাবার সময় আমাকে দেখিতে পাইলে আবার কটমট্ করে চেয়ে থাকা হয়।"

আর একজন বলেন, "শুধু কথা না কহিলে কোন ক্ষতি ছিল না, আজ কাল, উনি আবার মহা কুলীন হইয়াছেন। কুল-গৌরব করা হয়, বলা হয়, এমন নিখুঁত প্রসিদ্ধ কুল কোথায় মিলিবে না।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলেন,—"ওর সমস্ত দোষকে পারা যায়—কেবল ব্যবহার দোষেই লোকটা মাটি হইয়াছে। ওর প্রপিতামহ ছিল মুটের সর্দ্দার, পিতামহ ছিল গোমস্তা, বাপ ছিল ৩০ টাকা মাহিয়ানার কলম-টানা কেরাণি, তার ছেলে আজ মানুষকে মানুষ বলে না কেন? এত নবাব, এত ধিঙ্গি হইল কেন? টাকা হইলেই কি সকলকে রূঢ় কথা, কটু কথা কহিতে হয়?—একদিন সেই মূঢ়, একজন ভদ্র সন্তানকে এরূপ অপমানের কথা বলিল যে, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল। আমি হ'লে তৎক্ষণাৎ ক্যাবলচন্দ্রের দুই গালে চারি চড় মারিতাম।" এই কথা শুনিয়া অপর একজন উত্তর করিল, "বোধ হয়, মদের ঝোঁকে এরূপ কার্য্য করিয়া থাকিবে—ক্যাবল ত লোক বড় মন্দ নয়।" তিনি ও রসে বঞ্চিত; বড় বাজে খরচ করেন না; তবে পরের পয়সা পাইলে কালে ভাদ্রে একটু আধটু মদ খাওয়া আছে।

এসব কথা শুনিয়া একজন ধীর প্রকৃতি পুরুষ সর্ব্বদাই বলেন "যাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ কখন সংশিক্ষা পায় নাই, তাহাদের বংশধর কি এক পুরুষেই টাকা হইয়াছে বলিয়া সং ব্যবহার শিখিবে? ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? ভাল শিক্ষা পাইলে, ক্যাবলচন্দ্রের পুত্রগণ না হউক,—পৌত্র প্রপৌত্রগণ সম্ভবতঃ কখনই এরূপ ক্ষুদ্রচেতা হইবে না; এবং তাহাদের নজরও এত ছোট হইবে না।" কিন্তু এরূপ দূর আশায় কেহই বড় আশ্বাসান্বিত হইতেন না।

লোক পরশ্রীকাতর বলিয়াই হউক, অথবা ক্যাবল বাবুর প্রকৃত প্রস্তাবে দোষ আছে বলিয়াই হউক,—যে কারণেই হউক —অনেক লোকই ক্যাবলের নিন্দাবাদ করেন; এবং অনেকেই তাঁহার অশিষ্ট আচরণে মনের দুঃখে কাল যাপন করেন।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিত, যন্ত্রণায় অধিক অস্থির— ক্যাবলচন্দ্রের পিতা। বাপ বেটা বুড়ো, কালো, মাসে ১৫ টাকা পেনসন পায় সকলের উপযুক্ত মান খাতির রাখে; সাদাসিধে লোক—মান, অভিমান, খল কপট বড় একটা নাই। নানা কারণে শ্রীযুক্ত ক্যাবলরাম বাবু নিজ পিতার উপর অতিশয় বেজার হইয়াছেন; নানা কারণে জনক, পুত্রের চক্ষুশূল হইয়াছেন

বাপ কালো কেন? দশ্বানন জনক যদি ভ্রমরের ন্যায়, পরিপক্ক জম্বুফলের ন্যায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে ক্যাবলচন্দ্র বাবুর রঙ কখনই এত কালো হইত না। এক মাত্র পিতার দোষেই, পুত্রের সমস্ত সাবান মাখা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। লক্ষপতি হইলেন, গাড়ি ঘোড়া চাপিলেন, ইংরেজের বুট-পদ-রজ লইয়া উত্তমাঙ্গে মাখিলেন, তথাচ পৈতৃক অপরাধে, দুধে আলতার মত রং ফলাইতে পারিলেন না; সুতরাং পিতা যখন পুত্রের

সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেন, পুত্র তখন রোষকষায়িত লোচনে দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ করিয়া পিতার মুখ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন এবং আপনাপনি মনে মনে বলিতেন " রে মূর্খ পিত! তোমার বর্ণ দগ্ধ অঙ্গারের ন্যায় এরূপ কৃষ্ট বর্ণ কেন? তোমার নিমিত্তই, প্রতিদিন শতবার বিধৌত হইলেও আমার এ দেহের মলিনত্ব ঘুচিতেছে না; আমি বলিতেছি—এই পাপে তোমার সদ্গতি লাভ হইবে না।

পিতার দ্বিতীয় দোষ পুত্রের কথার বশ নহে; পুত্রের সহিত সমান উত্তর করেন। বাপ বেটা বড় বেয়াড়া লোক;—প্রত্যহ পদব্রজে গঙ্গাস্নানটী করা আছে, ইহা দেখিয়া ক্যাবল বাবুর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইত; ক্যাবলরাম মনে মনে ভাবিতেন—তেল মাখিয়া গামছা কাঁধে করিয়া হাঁটিয়া স্নান করিতে যাওয়া ছোট লোকের কাজ; উপযুক্ত পুত্রের ধারণা ছিল,—ইহাতে জনসমাজে কেবল তাঁহার অপমান হয়; বিশেষ সেরূপ অবস্থায় রাস্তার মধ্যে পিতাকে বাপ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়, সুতরাং গাড়ি করিয়া স্নান করিতে যাইতে বৃদ্ধের প্রতি হুকুম হইল; বৃদ্ধ সে কথা গ্রাহ্য করিলনা; কাজেই পিতা পুত্রের চক্ষুশূল হইলেন।

গঙ্গাতীরে একটি হাট আছে, বৃদ্ধ আবার হাট বারে নিজের ইচ্ছামত বাজার করিয়া জিনিস পত্র গামছায় বান্ধিয়া লইয়া আইসে। পুত্রের ভয়ে অতি গোপনে এ কাজ সম্পন্ন করিতে হয়; কিছুদিন পরে গোয়েন্দাগণ পুত্রের নিকট সংবাদ দিল, বৃদ্ধ এই দুষ্কর্ম্ম করে। তখন ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না হুতাশন হুহু জ্বলিয়া উঠিল; হর কোপানলে মদন ভস্মের ন্যায়, পুত্র-কোপানলে পিতা ভস্ম হইবার ও উপক্রম হইল।

অনুনয় বিনয়ে স্তব স্তুতিতে ক্রোধের বেগ সম্পূর্ণরূপে থামিল না। যে দিন অনল পিতৃ অঙ্গ স্পর্শ করিল, সেই দিন অবধি পিতার গঙ্গাস্নান বন্ধ হইল—সদর বাটীর সরহদ্দ লঙ্ঘন করিতেও নিষেধ হইল: পিতা নজর বন্দিতে রহিলেন—হতভাগ্যের ইহজন্মের সমস্ত সুখ ফুরাইল; প্রাণ ধারণার্থ দুবেলা চারিটি চারিটি অন্ন পাইয়া নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে বাস করেন—হুকুম ব্যতীত চৌকাট ডিঙ্গাইবার সাধ্য কি?—কেননা,—

দ্বারে ফেরে দৌবারিক ভীষণ মুরতি।" সুপুত্র ক্যাবলচন্দ্র বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয় আপনার পিতাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?" ক্যাবলরাম উত্তর দেন তাঁহার মেজাজ খারাপ হইয়াছে,—উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, কবিরাজের চিকিৎসা হইতেছে, এখন আবার বাহির হওয়া নিষিদ্ধ।" সুতরাং বলিতে হয়, ক্যাবল বাবু ধনবান্ হওয়াতে পরমগুরু পিতার যেমন দুঃখ, তত দুঃখ পাড়া প্রতিবাসিগণের মধ্যে আর কাহারও হয় নাই।

---

(২)

নবদূর্ব্বাদল শ্যাম ক্যাবলচন্দ্র রোজগারের প্রথম অবস্থায় বসন ভূষণে অতিশয় প্রিয় ছিলেন। নীল, পীত, লোহিত, অসিত-সিত বর্ণের—রঙ বেরঙের পোষাক শ্রী-অঙ্গে সুশোভমান হইত, বক্ষে ভৃগুপদ-চিহ্নের ন্যায়, ঘড়ি-বৃন্ত-সংলগ্ন বৃহত্তর সুবর্ণ-জিঞ্জির বিরাজ করিত; তদীয় নাসিকাগ্রভাগস্থিতা-মনোমোহিনী চসমা কত যুবক-কুলের মন হরণ করিত। ক্যাবল বাবু উঠন্তি বয়সে এইরূপই জবড়জঙ্গী বেশ-ভূষা করিয়া রাজ দরবারে গমন করিতেন। ক্রমে বহুদর্শিতার সাহায্যে বুঝিলেন, স্বয়ং কেবল

মূল্যবান কাপড় জড়াইয়া সঙ সাজিয়া থাকা প্রকৃত ধনবান এবং বাবুর চিহ্ন নহে। সেই বুঝিবার দিন অবধি তিনি তাঁহার সহিত কোচম্যানকে আলপাকা প্রভৃতি কাপড়ের ভাল ভাল চাপকান চোগা বিতরণ করিলেন। কিন্তু এরূপ কার্য্যে তাহার মনস্তুষ্টি হইল না; সহস্র বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে জ্বালা উপস্থিত হইল---ভাবিতে লাগিলেন সমাজের কি অত্যাচার!— "আমি অর্থবান হইয়াও আশা মিটাইয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিতে পাইলাম না,—আমার চাকর নফরে পরিতেছে, ইহা কি আমার সহ্য হয়? আমি যদি পরি, লোক আমাকে বুনিয়াদি বড় মানুষ না বলিয়া, নূতন বড় লোক বলিবে, সুতরাং (হয় ত) সমাজ আমাকে প্রকৃত বাবু বলিয়াও ডাকিবে না,—আমি কি হতভাগ্য!"

হতভাগ্য বাবুর দুঃখের ওর নাই। যখন পালকি গাড়ী করিয়া গমনাগমন করেন, তখন ভাবেন,—"আমি কি অধম, কোচম্যান আমার চাকর হইয়াও, আমার মাথার উপর বসিয়া গাড়ি চালাইতেছে। আমার গাড়ি, আমার ঘোড়া, কোচম্যান বেটা আমার বান্ধা মাহিয়ানার চাকর, তবু আমি এই কোচম্যানের পদানত! সমাজের কি অত্যাচার।"যৌবনের প্রারম্ভে ক্যাবলচন্দ্র ধর্ম্মসম্বন্ধে গোলযোগে পড়িয়াছিলেন! কি ধর্ম্ম মানিলে বেশী বাবু হওয়া যায়, তখন তাঁহার এই চিন্তাই প্রবলা হইল। ভাবিয়া ভাবিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন,-কিন্তু দিন কএক পরে, বয়স একটু পরিপক্ক হইলে বুঝিলেন, এধর্ম্মে মজা নাই,---আশানুরূপ সুবিধা এবং সুখ পাইলেন না। আজি কালি লোক জনের সাক্ষাতে ৮২ সিক্কা ওজনের টনূটনে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া-পরিচিত; বাস্তুভিটায় বৎসর বৎসর মা দুর্গার

প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করা হয় ; কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, নবশাখ, ইংরেজ, মুসলমান—সাধু, অসাধু, সজ্জন, অসজ্জন, সকল রকমেরই লোক নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। কিন্তু কুৎসাপ্রিয় প্রতিবেশিগণ বলেন, লৌকতার টাকার জন্য যত আটুপাটু, দুর্গোৎসবে তত টুকু—ততটুকু কেন, তাহার একতিলও, ভক্তি নাই।

স্নান আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করেন না ; মা কালির সম্মুখে বলিদান না হইলে ছাগমাংস ভক্ষণ করেন না, যবনের সহিত একাসনে বসিয়া তামাক খান না ;—তবে বিশ্বনিন্দুক লোকে কানাকানি করে, বাবু লুকাইয়া লুকাইয়া মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটী খান, এবং ফাউল-কারিরও সহিত বিলক্ষণ গুপ্ত প্রেম আছে। এইরূপ শ্রীমান ক্যাবল প্রকৃত বাবু নামে অভিহিত হইবার অভিলাষে, হিন্দুধর্ম্মের টীকা ললাটে ধারণ করত লুকোচুরি খেলাইয়া কাল কাটাইতেছেন।

শ্রীমানের যে কত দুঃখ, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? লোকজনের সাক্ষাতে উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিতে পারেন না,—তাঁহার বড় লজ্জা করে। পাকি তিনপোয়া চাউলের কমত সে উদর-বিবর পরিপূর্ণ হইবার নহে ?—কিন্তু বেশী আহার করা ছোট লোকের কাজ, নীচ-বংশোদ্ভব লোকের কাজ, এই ভাবিয়া আমাদের নায়ক, লোকজন—বন্ধু বান্ধবের সাক্ষাতে ভয়ে পূর্ণ মাত্রায় আহার করিতে পারেন না। তেল মাখিয়া মুড়ি, চাল কড়াই ভাজা খাইতেও বিলক্ষণ সাধ আছে, কিন্তু লোক লাজ-ভয়ে সে রসেতেও বঞ্চিত। বলা বাহুল্য, যখন নির্জ্জনে গুপ্ত-ভাবে অবস্থিত করেন,—তখন ইচ্ছামত অন্ন এবং মুড়ি, চাউল ভাজা উদরস্থ করেন ; আর ভাবেন, "আমার কি দুরদৃষ্ট,—গোপনে রসনা পরিতৃপ্ত করিতেই কি আমার জন্ম হইয়াছিল ?"

সংবাদপত্রের গ্রাহক হইবার সাধ আছে ; গৃহাভ্যন্তরে দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রের ছড়াছড়ি না থাকিলে লোকে বাবু বলিবে কেন ? তবে মূল্য দিবার সময় মারামারি করেন—বাপ রে বালাই রে, ডাক ছাড়েন—একাগজ কিছু নয়, ইহাতে কেবল বাজে কথা, মিথ্যা কথা লেখা থাকে শীঘ্রই ছাড়িয়া দিব,—বলেন।

দানধ্যান করিবার মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা জন্মে। গবর্ণমেণ্টের নিকটে খেতাব, সম্মান,—বিনা পয়সায়, শুধু-শুধু ত, পাওয়া যায় না ! আর দাতা না হইলেই লোকজনের নিকটই সম্ভ্রম থাকে কই ?—লোকে যে কৃপণ বলিয়া ফেলিবে ! সেই সময়ে শ্রীমান আমাদের বড় বিপদে পড়েন, ভেবে ভেবে তাঁহার সর্দ্দিগর্ম্মি হইবার উপক্রম হয়। এ দিকে এক পয়সা মা বাপ—গোরক্ত ব্রহ্মরক্ত ; ওদিকে টাকা খরচ না করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট পরিচিত হয়েন না—লোক জনের নিকট মান থাকে না। শেষে কি জনসাধারণের চক্ষে তাঁহার বাবুত্ব কম হইয়া দাঁড়াইবে ?"—সময়ে সময়ে এই ভাবনাতেই তিনি পাগলপ্রায় হইয়া উঠেন।

চাকর চাকরাণীকুলের উপর ক্যাবলচন্দ্র হাড়ে, হাড়ে চটা ;—কেননা তাহারা মাস পোহাইলেই মাহিয়ানা চাহে। মাহিনা দিবার সময় তাঁহার অন্তর দগ্ধ হয়—জীবনের মূলগ্রন্থি পর্য্যন্ত বিশুষ্ক হইয়া যায়।—কি জ্বালা কি যন্ত্রণা,—ও গুলোকে না রাখিলেও নয় (তা না হইলে আবার মান সম্ভ্রম থাকে না) রাখিলেও আবার মাহিনা দিতে হয়। সুতরাং মাসে মাসে দাস দাসীর বদল হয় ; যে একবার আইসে, পুনরায় সে আর আসিতে চাহে না ;—দূর হইতেই ক্যাবলরামের খুরে দণ্ডবৎ

করে! নাপিত ধোবা, পুরোহিত, পাচক সকলেরই এইরূপ ব্যাপার। ক্যাবলচন্দ্রের বিশ্বাস—বড় লোক হইলেই একটা না একটা বড় ব্যারাম থাকিবে, যথা—কাশ, অম্বল বহুমূত্র, হাঁপানি, মেহ ইত্যাদি। ক্যাবলরামের মহা ভাবনা, তাঁহার কেন ওসব ব্যারাম নাই ?—তবে কি তিনি বড় লোক, বাবুলোক নহেন? দেহ যে কেন ব্যাধিগ্রস্থ নহে,এই মহা ভাবনা, মহা দুঃখে তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না। কিন্তু উপায় ত নাই—কি করেন—অবশেষে মিথ্যা কথার আশ্রয় লইলেন; লোকের কাছে, বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলেন, "আমার আসম্যার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।" কখনও বলেন, "অম্বলের জ্বালায় গেলাম।" কখন যে কি কথা বলিয়া ফেলেন, তাঁহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সময়ে সময়ে গার্হস্থ্য কবিরাজের এক আধটা বটিকাও লোক জনের সাক্ষাতে উদরস্থ করা আছে। তথাচ পর-ঐশ্বর্য্য-দ্বেষী বিটল লোকে রটনা করে, "বাবুর ব্যারাম নাই।" এ সব কথা শুনিয়া ক্যাবলরামের কেবল গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়।

ক্যাবলরাম, প্রতিবাসী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, বাল্যকালের সমপদস্থ বন্ধু বান্ধবের উপর বিষেশ বিরক্ত; তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিলেই বিষম জ্বলিয়া উঠেন। কেন, কে বলিতে পারে তাঁহার মনের কথা, ভগবান ব্যতীত আর কে জানে? তবে সেই চিরকালের বিশ্বনিন্দুক বিশ্ব-অধিবাসিগণ বলেন—জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র দশাপন্ন—অনেকেরই চালা ঘর;—জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত সদালাপ করিলে, পাছে লোক মনে করে, ক্যাবলরামেরও এক দিন দরিদ্র দশা ছিল,—ইহাই তাঁহার দারুণ ভয়। সুতরাং জ্ঞাতি কুটুম্বকে চৌকাট ডিঙ্গাইতে দেন না ? ধনবান লোকের সহিতই আমোদ, আহ্লাদ করিয়া কাল কাটা-

ইতে তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা। ক্যাবলচন্দ্র, নিজ বৈঠকে বসিয়া, পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া,—"এ জগতে, কে প্রকৃত বাবু, কেইবা প্রকৃত মানুষ"—কেবল এই সকল কথারই আলোচনা করেন। যেমন পরিপক্ক কাঁটাল ভাঙ্গিলে মাছিকুল সমাকুল হয়, মহা মহোৎসব হয়, ক্যাবলরাম এখন সেইরূপ দশাগ্রস্ত। সেই সভায়, তর্ক বিতর্কের পর প্রায়ই স্থিরীকৃত হয়, এই নশ্বর জগতে, জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারে, ক্যাবলচন্দ্রই বাবু—ক্যাবলচন্দ্রই মানুষ। শ্রীমান তখন আনন্দবিহ্বল হয়েন,—আনন্দাশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া ভূতলে পতিত হয়।

অপর কাহাকেও "বাবু" বলিলে ক্যাবল মনে মনে বড় বেজার হয়েন,—অসহ্য হইলে কখন কখন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ফেলেন, বলেন, "বাবু কে?" তর্ক বিতর্কের মজলিসে, এক দিন একজন নিরীহ ভাল মানুষ স্থূল-বুদ্ধি লোক, কথাপ্রসঙ্গে হটাৎ বলিলেন, মহাশয়! রসিক বাবু বড় মন্দ লোক নহেন।" তখন ক্যাবলরামের রক্ত-চক্ষু কপালে উঠিয়া বিষম ঘুরিতে লাগিল—ক্রোধে গাত্র-রোম সোজা হইয়া দাঁড়াইল; দাঁতকপাটি যাইবার মত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, স্থূলবুদ্ধি! তোমার সংসারে জ্ঞান নাই। রস্‌কে আবার মানুষ—সে আবার বাবু?—যাকে তাকে বাবু বল—ইহা তোমার কোন্ দেশী আচরণ? তুমি জান, সে আমাদের চাকরেরও যোগ্য নহে; রামা, হরে, কেষ্টা, মোদো,—তুমি যে সকলকেই, ছত্রিশ জাতিকেই বাবু বলিতে আরম্ভ করিলে? পুনরায় এমন কথা আমার সাক্ষাতে উচ্চারণ করিওনা। সাবধান!"

বাবু বিষয়ক তর্ক শুনিয়া কেবল বাড়ীর শস্তিধর খানসামা বুঝিয়াছে,—যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে, জুয়াচুরি প্রবঞ্চনা, জাল

করে, লোককে কটুকথা বলে,—যে ব্যক্তি লম্পট, মদে যার অশ্রদ্ধা নাই,—আর এই সকল কাজের সঙ্গে যে প্রভূত টাকা রোজগার করে—সেই এ বঙ্গে বাবু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। ষষ্টিধর, ক্যাবলরাম বাবুর খুব পিয়ারের চাকর।

মেমসাহেব!

১নং

বঙ্গের মুখ-উজ্জ্বল-কারিণী, কুলের কমলিনী মিত্রদের বউ—শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র নূতন শ্বশুর গৃহে আসিয়া পাড়াকে সর-গরম করিয়া তুলিয়াছেন। মিসেস মিত্র বাঙ্গালা ভাষায় আউট, ইংরেজীভাষায় আউট হব হব হইয়াছেন, কারুকার্য্যগুলি পারিস্ এক্জিবিশনে কেবল পাঠাইবার অপেক্ষা আছে। আজ কাল তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পুস্তক পড়েন, এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আলমারিতে আছে; গৃহের ঝিকে রোজ প্রাতঃকালে উঠিয়া ১ ফোঁটা করিয়া ঔষধ খাওয়ান; অসভ্য দুষ্টা ঝি ঔষধের মর্ম্ম বুঝে না, মহৌষধ সেবনের সময় কেবল লুকাইয়া বেড়ায়। বৃদ্ধা ঝি একদিন অতি কাতর হইয়া বলিল —"বউ মা; রোজ ঔষধ খাইয়া আমার শরীরে আর কিছুই নাই, এক মুঠা অন্ন রোচেনা, আমি এক সিকে মাহিনা কম্ নিতে পারি, কিন্তু আর ঔষধ খাবনা।" মিসেস মিত্র অতি গম্ভীর ভাবে, নয়নদ্বয় বিস্তার করত ঈষৎ গ্রীবা দুলাইয়া বলিলেন—"হে গৃহ-দাসি! তোমার রোগের লক্ষণ কঠিন দেখিতেছি, তুমি আর অধিক দিন বাঁচিবে না—১০।১৫ বৎসর মধ্যে অবশ্যই তোমার দেহ পঞ্চভূতে মিশাইবে!"

"তবে চিকিৎসকের নিয়ম, রোগ যেমন কেন শক্ত হউকনা, অবশ্যই ঔষধ সেবন করাইবে; সুতরাং অদ্য হইতে আমি তোমার চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইব। চাহিয়া দেখ, সেই এক ফোঁটা ঔষধে তোমার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, অঙ্গে বল সঞ্চার হইবে, বৈকালে মনও অতি স্ফূর্ত্তিতে থাকিবে"—বৃদ্ধা দাসী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"দোহাই বৌমা আমাকে রক্ষা করুন—আমার তিন কুড়ি বছর বয়েস হলো, এজন্মে আমি অষুদ কাকে বলে তা জানিতাম না—আজ এক মাস ধরে আমাকে কেন ওষুদ খাওয়াচ্চেন, তা বল্‌তে পারি না—দোহাই মা আমাকে ছেড়ে দিন—বেলা হোলো, থালা পাথর কিছুই মাজা হয় নাই, দেরি হইলে গিন্নী আমাকেই বোক্‌বেন,—আমি বুড় শিবের দিব্বি করে বল্‌চি,—আমার কোন ব্যারাম হয়নি।"—কাদম্বিনী বলিয়া উঠিলেন,—"চুপ্ কর চুপ্ কর, এ রোগ কথা কহিলে বৃদ্ধি পায়, তুমি ক্ষণেক আমার নিকট বসিয়া স্থির হও।" তথন বৃদ্ধা গতি মুক্তি নাই দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। মিসেস মিত্র (স্বগতঃ)—আহা কি শোকের বিষয়, এযে উন্মাদের লক্ষণ দেখিতেছি; এই মাত্র কতই প্রলাপ বকিল, আবার তখনি চক্ষে জল আসিল, এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া ভার; আমার যতদূর সাধ্য চিকিৎসা করিব; প্রকাশ্যে বলিলেন—"বৃদ্ধে, গৃহদাসী, সংকটাপন্ন-জীবনে! তুমি জান, রোগীকে ঔষধ দান, এবং তাঁহার শুশ্রূষা করা রমণীর একটী প্রধান পবিত্র ধর্ম্ম,—তুমি সংবাদ-পত্রে অবশ্যই পড়িয়াছ, বিগত রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে কত শত মহিলা আহত সৈনিকদিগের সেবা করিয়া কত প্রশংসার পাত্রী হইয়াছেন, কিরূপ পদ-গৌরব লাভ করিয়াছেন। তোমাকে অদ্য হইতে দিবসে তিনবার করিয়া প্রতিবারে দুই ফোঁটার হিসাবে

ঔষধ খাইতে হইবে! তোমার ব্যায়াম আবশ্যক, এবং আজি হইতে তোমাকে প্রত্যহ সকালে বৈকালে ভাগিরথী-তটে রোজ একঘণ্টা করিয়া ভ্রমণ করিতে হইবে; ইহাব্যতীত ১০৮ ডিগ্রী উত্তপ্ত জলে ২৲ টাকা গজ ফ্লানেলের দ্বারা রাত্রি নয়টার সময় তোমার পৃষ্ঠ দেশে ফোমেণ্ট করিতে হইবে; পথ্য আজ হইতে চিকেন-ব্রথ এবং পাঁও-রুটি।"—বৃদ্ধা দাসী কিছুই বুঝিতে পারে নাই,—অতিশয় ব্যগ্র হইয়া বলিতে লাগিল,—"বউমা, উঠানে রোদ আসিয়াছে, এখনও ঝাঁট পড়ে নাই, আজ গিন্নি আমাকে বড় গালি দিবেন; শীগ্রি ছেড়ে দেন, আমি বড় গরীব, কখন কারু কিছু মন্দ করিনি—আমাকে কেন এমন কচ্চেন।" এই বলিয়া বৃদ্ধা যাইতে উদ্যত হইল; বউমা তখন, দাসী প্রকৃত উনমাদ হইয়াছে দেখিয়া, বস্ত্রের দ্বারা দাসীকে খাটের পায়ায় বাঁধিবার উংযোগ করিলেন। দাসী মহা আর্ত্তনাদে চীৎকার করিয়া উঠিল। গভীর আর্ত্তনাদের শব্দ পাইয়া কাদম্বিনীর শাশুড়ী বুড়ী-মা দৌড়িয়া আসিল! বুড়ী-মা তখন গো-সেবায় নিযুক্ত ছিল, শ্যামলী নাম্নী দুগ্ধবতী গাভীর সেবা স্বয়ং না করিলে তাঁহার মনঃপূত হইত না। হাতে-পায়ে-গোবরা, এলোথেলো কেশা, স্খলিত-মলিন-বসনা কাদম্বিনীর শাশুড়ী ঠাকুরাণী এই বিপরীত ব্যাপার দেখিয়া ভীত স্তম্ভিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বউমা, একি—একি," বউ মা উত্তর দিলেন—চুপ "চুপ-গোল করিওনা, রোগীর কষ্ট হইবে; আর তোমাকে একটা উপদেশ দি, তোমার এ বেশ কেন?—হস্ত পদে কৃষ্টবর্ণ মৃত্তিকাবৎ অপরিষ্কার ওপদার্থ গুলি কি? সুগন্ধময় হনিসোপ দিয়া ওগুলি শীঘ্র পরিষ্কার করিয়া ফেল, নচেৎ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা; আর এদেশে বিশেষ একটা কুব্যবহার দেখিতেছি,—তোমার অঙ্গে

সেমিজের উপর কোর্ত্তা নাই কেন?—আমার সম্মুখে অন্ততঃ সেমীজ গায়ে দিয়া আসা উচিত ছিল—বৃদ্ধে, তোমার আবরণহীর্ণ বেশ দেখিয়া আমার অতিশয় লজ্জা করিতেছে,—কিন্তু তুমি স্বামীনগেন্দ্রের জননী, সুতরাং তুমি কিছু দয়ার পাত্রী,—তোমাকে আমার এই কোর্ত্তাটী দিলাম, শীঘ্র অন্তরালে গিয়া অঙ্গ বিধৌত করত উহা পরিধান কর!" এই বলিয় কাদম্বিনী—স্বামীনগেন্দ্রের জননীর গায়ে একটা জ্যাকেট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কার্য্যগতি দেখিয়া বৃদ্ধ হুতাশে চেঁচাইয়া উঠিল—"ওমা একি হলোগো—ওমা—একি হলোগো, বৌমা আজ এমন কচ্চেন কেন গো? আমার বউমাকে বুঝি আজ ডাইনে খেয়েছে, বাবা নগেন! কোথা গেলিরে?—একবার শিগ্‌গিরি আয়।" বৃদ্ধার গলার শব্দ পাইয়া পাড়ার অনেক প্রবীণা স্ত্রীলোক জমিয়া গেল। কাদম্বিনী তাহাদিগকে দেখিয়া অতি কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন—হায়, হায়, বঙ্গের কি দুর্দ্দশা—এই সকল ভগিনীগণ অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পরম পিতা পরমেশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখে নাই—ইহাদের অঙ্গে পরিধান নাই, পায়ে মোজা নাই, হস্তে পুস্তক নাই।" প্রবীণা-গণ বলিতে লাগিল—তাইত মা, এযে সত্য সত্যই এঁকে আজ পাকা ডাইনে খেয়েছে। ওপাড়ার নাপিত বৌয়ের জলপড়া ভিন্ন কিছুতেই এ ডাইন ছাড়বে না।" নগেন্দ্র বেচারা স্কুল মাষ্টার, ৩০ টাকা মাহিনা পায়—তাহাতে কুলায় না; আবার দুবেলা দুটী প্রাইভেট টুইশন আছে। সকালে তাই ডেপুটী বাবুর ছেলেকে পড়াইতে গিয়াছেন, ক্রমে লোক মুখে শুনিলেন—বাড়ীতে ভারি বিপদ। অমনি শশব্যস্তে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসি-লেন—দেখিলেন বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য—ভয়ে আর পা

চলেনা। তখন স্বামীর আগমনবার্ত্তা পাইয়া, স্ত্রী সসম্ভ্রমে উঠিয়া স্বামীকে নিজ কক্ষমধ্যে লইয়া আনিবার জন্য অগ্রগামিনী হইলেন; এবং সেই লোকারণ্য মধ্যে সেক্‌হ্যাণ্ড করিবার উদ্‌যোগ করিলেন। স্বামী লজ্জিত, অধোবদন, স্তব্ধ, মুখ শুকাইয়া গেল, চক্ষু কপালে উঠিয়া দাঁতকপাটী লাগিবার উপক্রম হইল; প্রবীণারা বলিয়া উঠিলেন,—উঃ! বড় শক্ত ডাইন, কচি বউটীকে একবারে হাড়ে হাড়ে খেয়েছে, জলপড়ারর কর্ম্ম নয়; বদ্দীপুরের রামসুন্দুরে হাড়ী-ওঝাকে আনিতে হইবে।" স্ত্রী ক্রমে গিয়া স্বামীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন—"ছি! নাথ! আমার গাউন কৈ আনিলে না? তোমার প্রণয়িণীকে এ বেশে রাখিতে তোমার তোমার কি লজ্জা বোধ হয় না?

নগেন্দ্র বাবুর মাতা বধূর ব্যাধি নিবারণের জন্য রাম সুন্দুরে ওঝাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। গোলমালে দাসীটা যে কোথায় পলাইল, তাহা কেহ ঠিক করিতে পারিল না।

—০—

ভাল কে, সভ্য, না অসভ্য ?

গভীরতত্ব গবেষণা জানিনা, বাল্মীকি বেদব্যাস বেদ-বাই বেল বুঝি না; হিউম-হালাম হামিল্টনকে চিনি না; মিল-মেকলে মোক্ষমূলরের সঙ্গে মিশি না; অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। ভবে আসিলাম, ইংরেজের সঙ্গে মজিলাম, সংসার সাগরে ডুবিলাম, কত খাবি খাইলাম, তথাচ সভ্যতা কি— বুঝিলাম না। হায় যদি বুঝিলাম না, যদি এ স্বর্গসুধা পান পান করিতে পাইলাম না, তবে মরিলাম না কেন? খৃষ্টানের ইউরোপ সভ্য, কি, হিন্দুর ভারতবর্ষ সভ্য? ইংরেজ সভ্য, কি বাঙ্গালী সভ্য? আজ এ ইংরেজরাজত্বে বসিয়া, ইংরেজের

মোহিনী বিদ্যায় মোহিত হইয়া, ইংরেজের জন্য জীবন ধারণ করিয়া, একথার উত্তর কেমন করিয়া দিব? যে ব্যক্তি পরের খায়, পরের ঘরে বেড়ায়, কিসে পরের জিনিসটী উদর-সাৎ করিতে পারে, তাহার চেষ্টায় থাকে, তাহাকে সভ্য বলিব কেমন করিয়া? বল দেখি, ভাই! কে লোক ভাল? তোমার অসুখ হইল, আমি গিয়া তোমার সেবা শুশ্রূষা করিলাম, ডাক্তার ডাকিলাম, পথ্যের জিনিস আনিলাম, গাত্র দাহের সময় গায়ে হাত বুলাইলাম; অসভ্য হিন্দু মতে ত এই রূপই বন্ধুর কার্য্য। কিন্তু সভ্য-সাহেবের ব্যবস্থা কি জান? পীড়িতের গৃহে গিয়া বাহিরে দ্বারবান বা অপর কাহারও নিকট সাহেব নাম লিখিয়া রাখিয়া আসিলেন;—জানান-হইল, আমি তোমায় দেখিতে আসিয়াছিলাম। সাধারণত খৃষ্টান, চোখের দেখা দেখেন, হিন্দু অন্তরের সহিত দেখেন।

দেখ দেখি, হিন্দুর দান কেমন পবিত্র! ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিল, ক্ষুধায় অন্তর আকুল, পিপাসায় প্রাণ ব্যাকুল, হিন্দু তাহাকে অন্নজল দিল, শান্ত করিল। কিন্তু সাহেবের বাটী গেলে, সেই ভিখারিকে প্রথমে ত সাহেবের কুকুর কামড়াইতে আসিবে, কুকুরের হাতে প্রাণ বাঁচিলে চাপরাসীর গলা ধাক্কা খাইতে হইবে। ভিখারিকে দেখিয়া সাহেবের বিরক্তি বৈ দয়া হইবে না; অথচ সাহেব দাতা—সভায় যান, বক্তৃতা করেন, দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে চাঁদা দেন—আর সেই দানের কথা লইয়া সংবাদপত্রে জয় ঢাক বাজে,—সাহেবের দান সার্থক হয়। যদি কোন দরিদ্র প্রতিবাসী উপবাসী থাকে, হিন্দুর মন কাঁদিয়া উঠে; অমনি তাহাকে আপন গৃহে ডাকিয়া আনিয়া আহার দেন,—কিন্তু সাহেবের নিকটের বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নাই, সতত

দূরদৃষ্টি। টিম্বকটু কোথায় হয়ত জানেন না, সে দেশের লোক কেমন তাহা শুনেন নাই ; যদি তারে সংবাদ আসিল, অগ্নিদাহে সে দেশের গৃহাদি পুড়িয়া গিয়াছে, লোক সব নিঃস্ব হইয়াছে এবং বিলাতে পাদরিগণ এজন্য চাঁদার খাতা বাহির করিয়াছেন, তাহা হইলে সাহেব অমনি শত-যোজন দূরবর্ত্তী টিম্বকুট অধিবাসীদের দারিদ্র্যদুঃখ ঘুচাইবার জন্য চাঁদা দিবেন ; অথচ পাড়ার লোক যে অনাহারে মরে, সেটা একবার দেখিবেন না। আবার এদিকে দেখুন, সাহেবের চারিটা খানসামা আছে, দুইটা বাবুর্চি আছে, একটা পোষা বানর আছে ; একটা হরিণ আছে, দুটা পাখী আছে, কত টাকা, মিছা ব্যয়ে যাইতেছে ; তাহাতে দৃক্‌পাত নাই—কিন্তু ভাই আসিয়া যদি দুই দিন রহিল, অমনি ভ্রাতার নামে খরচের বিল হইল। তাই জিজ্ঞাসা করি, ভাল কে ? অসভ্য হিন্দু—না, সভ্য সাহেব ?

সভ্যতা-স্রোতে সত্য কথাও ভাসিয়া যাইতেছে। সভ্যসাহেব বাড়ীতে আছেন,—কার্য্যে ব্যস্ত। চাপরাসী বলিল "সাহেব বাড়ী নাই ;"—সাহেব, ভৃত্যের এমনই সংশিক্ষক ! আগে আমাদের দেশে চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষ রাখিয়া দেনা পাওনা চলিত ; কিন্তু সাহেব সমাগমে, সভ্যতার বৃদ্ধিতে চন্দ্র সূর্য্য বড় আর কলিকা পান না, ক্রমেই উন্নতি হইল ; সূর্য্যের পরিবর্ত্তে সাদা কাগজে লেখা পড়া চড়িল,—তার পর ইষ্টাম্প কাগজে পাকা দলিল হইল। কিন্তু তাহাতেও ফুঁং বাহির হইল,—অবশেষে রেজষ্টরি—বিশেষ-রেজষ্টরি প্রথা চলিল,—কিন্তু তবুও সন্দেহ ঘুচিল না। সভ্যতার আঁটাআঁটিতে সকলে যেন অবিশ্বাসী ও অসত্য-বাদী হইয়াছে। তাই জিজ্ঞাসা করিতে হয় ভাল কে ?

সাহেবী প্রেম কেমন? সভ্য জাতির স্ত্রী, স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আর একটা স্বামী লয়;—স্বামী, স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া, আর একটা স্ত্রী লইতে পারে। ভাল বাস, ভাল বাসিব—. আহার দিতে পার, তোমার হইব,—সুখে রাখ, মিষ্ট কথা শুনাইব,—পেলা দাও, গান গাইব; সভ্য জাতির এইরূপ নীতিতে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যেন প্রেমের বেচা কেনা চলিয়াছে। কিন্তু হিন্দু রমণীর অতুলনীয়, অপরিমেয় প্রেমের লক্ষণ সভ্য সাহেব-রমণীতে নাই। তোমার হৃদয়,—আমার হৃদয় এক—এভাব সাহেবের আছে কি? সভ্য দেশে সতীত্ব বাজারদরে যেন বিক্রীত হয়। আদালতে ক্ষতিপূরণের টাকা দিলেই দুষ্ট লোক নিষ্কৃতি পায়। হিন্দু রমণীর সতীত্ব প্রাণের অপেক্ষা গরীয়ান—শুধু অর্থদণ্ডে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে স্বতঃই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, ভাল কে? সভ্য ইউরোপ ভাল, না অসভ্য হিন্দু ভাল? খৃষ্টান, না, হিন্দু? আমি মিল্ পড়ি নাই, বুদ্ধির ভ্রম হইতে পারে; যাহা সোজা বুঝিয়াছি, তাহাই বলিলাম, চিন্তাশীল পাঠক এবিষয়ের বিচার করিবেন।

বাস্তু ঘুঘু।

মানবদেহে যেমন চুলকণা, পশুর অঙ্গে যেমন মাছি, গাছের গায় যেমন কাট পীপঁড়া, সেইরূপ লোকসমাজে কতক গুলি বাস্তু ঘুঘু আছেন! ঘুঘুর চাল চুলা নাই, উদরান্নের সংস্থান নই—কেবল গৃহস্থের প্রাচীরে বসিয়া ডাকেন, "ঘু" "ঘু" আর সুবিধা পাইলে রন্ধনগৃহে ঢুকিয়া দুধের কড়ায়ে মুখ দেন। নদীতে কুম্ভীর

আছে, বনে বাঘ আছে, স্বর্গে বেশ্যা আছে, সমাজে ঘুঘু আছে। মেঘ ছাড়া আকাশ নাই, কলঙ্ক ছাড়া চাঁদ নাই, সং ছাড়া যাত্রা নাই, গহনা-বাতিক ছাড়া রমণী নাই,—ঘুঘু ছাড়া সমাজ নাই,—তবে কম আর বেশী। বঙ্গসমাজে আজকাল যেন ঘুঘুর ধড়ফড়ানীটা—কিছু অধিক মাত্রায় দেখা দিয়াছে। ঘুঘুগণ মোড়ের মাথায় দোকান খুলিয়া জটলা আরম্ভ করিয়াছে, লাড়ুতে বিষ মাথাইয়া পথিককে বেচিতেছে; সুবুদ্ধি পথিকের তাহা তিক্ত লাগায় থুথু করিয়া ফেলিয়া দিতেছে। ইহাতে বঙ্গীয় সমাজের কোন ক্ষতি নাই,—তবে দুই চারি জন তরলমতি বালকের হৃদয়ে যে হলাহল ঢালিয়া দেয়, পরকাল নষ্ট করে, এই যা দুঃখ। এ মশকের ভোঁ-ভোঁয়ানি নিবৃত্তির জন্য, এই চামচিকার চিকচিকিনি থামাইবার জন্য কামান পাতিবার দরকার নাই,—তবে কিনা ইহারা দুই একটা ছেলে খারাপ করিতেছে, তাহাতেই দুই এক কথা বলিতে হইল।

বালকগণ নানা কারণে বহিয়া যাইতেছে। প্রথম, বিদ্যালয়ে অশিক্ষা। পণ্ডিত, গ্রাম্য পাঠশালে, বালককে শিক্ষা দিতেছেন, দেখ, দরজা বন্ধ করিয়া, ঘরের ভিতর স্নান করা উচিত,—বাহিরে স্নান করিলে গায়ে বাতাস লাগিয়া সর্দ্দি হইবে। গরীব বালকের এক খানি বই ঘর নাই—তাহাও মাটীর। ঘরের ভিতর স্নান করিলে, মেজেতে কাদা হইলে, বালক শুইবে কোথায়,—সে বন্দোবস্ত গুরুজী করিলেন না; সাহেবের স্বাস্থ্য-গ্রন্থে যাহা লেখা আছে, সেই বীজমন্ত্র, গুরু, শিষ্য-কর্ণে ফুঁ দিয়া দিলেন। ধন্য গুরু! আর ধন্য গুরুর কর্ত্তাগুরু! তার পর বড় হইয়া স্কুলে ইতিহাস পাঠে বালক শিখিল, বক্তিয়ার খিলিজি সতের জন মুসলমান আনিয়া বঙ্গদেশ জয় করে, আর ক্লাইব,

পলাশী-ক্ষেত্রে দুই হাজার ফৌজ লইয়া নবাবের ষাইট হাজার সৈন্যকে সম্মুখসমরে পরাস্ত করিয়া বঙ্গভূমি অধিকারে আনে;—এই ভুল শিক্ষা বালকের ক্ষীণ মস্তিষ্কে জন্মের মত নিহিত রহিল, অথচ বালক বয়ো-বৃদ্ধি সহকারে "ইতিহাস-পণ্ডিত" হইয়া উঠিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে এম, এ দিলাম, আর্কিমিডিস্ যে সব "প্রবলেম্" ঠিক করিতে পারেন নাই, তাহাও অকাট্যরূপে প্রমাণ করিলাম; ক্রমে পাইথাগোরসের জ্যেষ্ঠ তাত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু বাড়ীতে বৃদ্ধ ঠাকুর মা গরুর জন্য খড় কিনিয়াছেন, ৮ টাকা করিয়া কাহন, এক পণ ১৭ আটীর দাম কত? আমি অমনি মাথা চুল কইতে লাগিলাম, বিষম বিভ্রাট বুঝিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে ধীরে ধীরে তথা হইতে পলাইলাম;—পণ্ডিত হইলাম বটে, কিন্তু আমার মত মূর্খ দুনিয়ায় আর কেহ রহিল না। আমার উচ্চ-শিক্ষা অশিক্ষা বা কুশিক্ষা হইল,—

"পিতল কাটারি, কামে নাহি আয়ল,
উপরহি ঝক্‌মক্ সার।"

এই ত শিক্ষা; তাহার আবার কতরূপ বজ্র বাঁধন, নাগপাশ ছাঁদন দেখুন,—সকল বালকের সমান চৌকস নজর হওয়া আবশ্যক, নহিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ নিষেধ। অঙ্ক বিদ্যা পড়িতে প্রবৃত্তি নাই,—পড়া,—পণ্ডশ্রম বোধ করি, ভাল জানি না, প্রতিবারে আঁকে নম্বর কম হয় বলিয়া ফেল্ হই, প্রতি বৎসর সংসারের সকল আশা, সকল সুখ ফুরায়, অথচ জোর করিয়া,বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আঁকে পণ্ডিত করিবেন, আঁকে আধ নম্বর কম হয় বলিয়া অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে তাড়াইয়া দিল। আমি পথের ভিকারি হইলাম, বওয়াটে ছেলের খাতায়

নাম উঠিল, পিতা কু-পুত্র মনে করিলেন,—অসার সংসার, জগৎ জীর্ণারণ্য বোধ হইল। কেন বাপু, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাকে একঘরে করিয়া তোমরা আমার ইহকাল পরকাল মাটী করিলে? তুমি বিজ্ঞ পণ্ডিত; তুমি বলিবে, 'যে বালক সাহিত্যে প্রতিভাশালী জীব, সে কি চেষ্টা করিলে আঁকে, খেলা-রাখা-গোছ, 'দুকুড়ি সাত রাখিতে পারে না?' আমি বলি, প্রকৃতই পারে না, যাহাতে যার প্রবৃত্তি নাই, সে বিষয়ে পরিশ্রম করিয়া বৃথা সময় নষ্ট ও শরীরক্ষয় করিবে কেন? আরও তুমি বলিবে, "একটু আধটু আঁক না শিখিলে, সংসারে চলিবে কেন?" সংসারের আঁক, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কিরূপ শেখান হয়, তাহা ত কাহারও অগোচর নাই।

মানিলাম, আঁক না জানিলে সংসার চলে না,—কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া, হাবুডুবু খাওয়াইয়া, বালককে সুখ-স্বর্গ হইতে অনন্ত নরকে ফেলিয়া দিলেই কি সংসার চলে? লঘু পাপে গুরু দণ্ড কেন? শাক চোরের ফাঁসী কেন? ঘরে মশা হইয়াছে বলিয়া ঘর পোড়ান কেন? সাহিত্য-ইতি-হাসে আমাকে এণ্ট্রেন্স এলে, বি, এ, পাশ করাইয়া আমাকে না হয় একটু ছোট রকমের সার্টিফিকেট দাও না? অপরকে হীরা-খচিত মুক্তার মালা বসান সোণার পদক দাও; আমাকে বিলাতি মুক্তা বসান, আট আনা খাদের একখানি রূপার পদক দাও;—তাহা না করিয়া আমাকে তাড়াও কেন? সংসারে ডোর কৌপীন-ধারী ফকীর কর কেন? তাই বলিতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় একটা বাস্তু ঘুঘু!

সমাজ-ঘুঘুদের উপদ্রবেও ঝটিকা-আন্দোলিত ক্ষুদ্র-নলিনী-বৎ বালকের হিয়া থর থর কাঁপিতেছে। বালক বন্ধু তায়

শুনিল, ইংরেজী-মতে বিবাহ না করিলে, সংসারে সুখ হয় না, বাইশ বৎসরের বালিকাকে কুললক্ষ্মী না করিতে পারিলে কুলের উদ্ধার হয় না, বিবাহের অন্তত ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে প্রণয়-পাত্রীর নিকট আসা যাওয়া না করিলে, প্রেম পবিত্র হয় না। আর প্রণয়িনী ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে না জানিলে প্রণয়ে জমাট বাঁধে না। কুলোকের নিকট বালকের এই কুশিক্ষা জন্মিল; ক্রমে সংস্কার বদ্ধমূল হইল;—বালক অধঃপাতে গেল। এমনও শুনিয়াছি, এক জন পমেটম-মাখা, টেড়ি-কাটা পরিপক্ক বালক একবার পিতামহকে বলেন, "যে রমণী ভাল ইংরেজী না জানে, এবং সংস্কৃতেও যাঁহার জ্ঞান কম, তাঁহাকে আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহি।" পিতামহ বলিলেন, "ভাই হে, বিদ্যাসাগর এবং টনি সাহেবকে একত্র না করিলে ত বিবাহ দেওয়া হয় না।" একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিদ্যালয়ে পড়িতে দেন। বাটীতে দুর্গোৎসব উপস্থিত, পিতা, জগন্মাতা দশভুজাকে প্রণাম করিলেন—অষ্টম-বর্ষীয়া পণ্ডিতা কন্যা বলিয়া উঠিলেন, "ছি বাবা! তুমি মাটীর পুঁতুলকে প্রণাম কর! গুরু-মা বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পান না, তিনি নিরাকার।" পিতা বলিলেন, আমার দোষেই তিনি নিরাকার হইয়াছেন; দুদিন স্কুলে গিয়া তুমি যে শুকদেব গোস্বামীর মত "যোগ" শিখিবে, তাহা আমি জানিতাম না। এ সকলই ঘুঘুগণের "ঘুঘু" ডাকের ফল। অধিক কথা বলিব না, বালকগণ যেন বাস্তুঘুঘু দেখিলে একটু সাবধান হয়েন।

কুরুচি।

আজকাল এক আধ জনকে রুচি-রোগে ধরিয়াছে। রুচি-রাজ থাকিয়া থাকিয়া যেন চমকিয়া উঠিতেছেন, বাপরে! ঐ কুরুচি, ঐ বাঘ—খেলেরে, খেলে। ইহা মস্তিষ্কের বিকৃতি, হৃদয়ের পক্ষাঘাত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কোন বিষয়েই অতি বাড়াবাড়ি কিছু নয়,—অতি শব্দটা অনেক সময়েই খারাপ। অতি-মানে কুরুরাজ দুর্য্যোধন রাজ্য হারাইলেন, অতি দানে বলিরাজ পাতালে গেলেন, অতি-ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে য়িহুদিগণ বাস্তভাটা ছাড়া হইলেন, অতি তেজগর্ব্বে ফরাসী-বিষদণ্ড জর্ম্মাণীর নিকট ভগ্ন হইল। আর অতি-রুচি-রুচি করিয়া কতকগুলা লোক আজ আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছে। ইহাদের মনের মতলব কি, তাহা জানি না; তবে এই বুঝি, রোগ বড় বিকট।

রৌচিক পুরুষের লক্ষণ,—মুখ খুব গম্ভীর, হাসি এক বারে নাই, দূর হইতে দেখিলে বোধ হইবে, যেন ইহাঁর পুত্রটী অদ্য যমালয়ে গিয়াছে; অথবা নারিকেল গাছে যেন বাজ পড়িয়াছে; পুরুষ-প্রবর অতি ধীরে ধীরে, সতর্কতার সহিত ভাবিয়া চিন্তিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া কথা কন,—পাছে কুরুচি আসিয়া পড়ে। যদি কেহ একটু হাসি হাসি মুখে, তাঁহার নিকট গল্প করিল, "নদীর ধারে বাগানে বেড়াইয়া মন বড় প্রফুল্ল হইয়াছে।" রুচি অবতার এই কথা শুনিয়া অমনি শিহরিয়া উঠিলেন,—হায়, হায়! কি করিলে, বন্ধু!—একে নদীর জল ধীকি ধীকি বহিতেছে,—তার উপর আবার বাগান, অবশ্যই সেখানে মল্লিকা, মালতী, যুঁই, বকুল ফুল

ফুটিয়া ছিল,—বন্ধু! বল দেখি, কি শর্ব্বনাশ করিয়াছ? সে যাহা হউক, সেখানে যখন তোমার মনে কুরুচি-ভাব উদয় হইয়াছিল, তখন তিন বার তুমি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলে কি?"

এত ভয় কেন? আমারা জানি, এমনও কেহ কেহ আছেন, যিনি প্রকৃতকুরুচির কার্য্যে যত বেশী লিপ্ত, তিনিই কথিত 'কুরুচি' কথায় তত বেশী আতঙ্কগ্রস্ত! কোন নগরে একজন বাবাজী বাস করিতেন; প্রকাশ ছিল, লক্ষ হরিনাম না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করিতেন না, আর লোক দেখিলেই উচ্চরবে "রাধে, রাধে, রাধে" বলিয়া উঠিতেন। ক্রমশ তাঁহার হরিনামের ঝুলি কিছু অধিক লম্বা হইতে লাগিল, তিলক, ফোঁটা, কণ্ঠিমালা কিছু অধিক বৃদ্ধি পাইল। শেষে জানা গেল, প্রথম তিনি পাড়ার একজন মাত্র বৈষ্ণবীকে অনুগৃহীত করিতেন,—এখন শত্রুর-মুখে-ছাই-দিয়া, তিন চার জন তাঁহার অনুগ্রহের পাত্রী। কোন কোন নব্য বাবু, ঠিক্ ঐ বাবাজী-প্রকৃতিক হইয়াছেন; স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হেতু, পরের কুলবধুকে ক্রমে যত অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত গোপনে লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন; ততই দিবসে লোকালয়ে তাঁহার রুচি মাহাত্মের বক্তৃতা বাড়িতে লাগিল। কেহ যদি তাঁহাকে বলিল, "কদম্ব-বৃক্ষ" তাহার উত্তর হইল, 'ছি ছি!" ও কথা মুখে আনিও না,—কদম্ব নাম করিলেই আমার মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ মোহন বাঁশী হাতে করিয়া আড় নয়নে গোপিনীদের পানে চাহিয়া আছেন—ক্রমে বস্ত্র-হরণেরও সব কথা স্মরণ হয়।" কদম্ব বলিলে, বরং রক্ষা আছে, দাড়িম্ব বলিলে, একেবারেই মূর্চ্ছা, বুঝি বা ডাক্তার ডাকিতে হয়! কোকিলের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন,

ফুলের ফোটন সবই কুরুচি। জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় রমণীর নামে, মুচকি হাসির নামে, তিনি কেবল চম্‌কে চম্‌কে উঠিতেছেন। অপরাধী ব্যক্তি, চিরকালই লাল পাগড়ী কনষ্টেবল দেখিলেই, মনে করে, বুঝি আমাকেই ধরিতে আসিতেছে!

আবার কতকগুলি-সুশীল সুবোধ ছেলে হ্যাপায় পড়িয়া, স্রোতে ভাসিয়া—কুরুচি, কুরুচি আরম্ভ করিয়াছে। তাদের কিছু দোষ নাই, তরলচিত্তে, যা শুনে, তাই শিখে। ফল কথা, এইরূপ ভণ্ডামির বড় বিষময় ফল ফলিবে। যে ব্যক্তি, সংস্কৃতের কিছুই জানেন না, করিত্ব রস কিছুই বুঝে না, সেও আজ কাল বলিতে আরম্ভ করিয়াছে;—কালিদাসের কাব্য অপাঠ্য কারণ কালিদাস কুরুচি! যে মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ভগবদ্‌-গীতা আছে, শান্তিপর্ব্বে যোগ-কথন আছে সে মহাভারত অপাঠ্য;—কেননা মহাভারতে, কুমারীকালে কুন্তীর সূর্য্যসঙ্গম ঘটিয়াছিল, পাণ্ডুর মাদ্রী সহবাসে মৃত্যু হইয়াছিল;—রামায়ণও অপাঠ্য, কেননা রামায়ণে রম্ভাবতী হরণের কথা আছে। তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, থিয়েটার কুরুচি, বাইনাচ কুরুচি। রঙ্গভূমের সীতা দেখিলে, যাঁহার মনের ভাব বিকৃত হয়, বাইজির হস্তদোলন দেখিলে যাঁহার হৃদয় ভয়ে থর থর কাঁপে, তাঁহাতে মনুষত্ব কম,—পশুত্বের প্রাধান্যই বেশী। পশুভাব প্রবল না হইলে, মন সহজে ও-রকম খারাপ হইবে কেন? যে সমাজে এইরূপ পশুভাব যত অধিক, সে সমাজে উন্নতি ততই কম। যে সমাজে পশুত্ব অধিক, সে সমাজে সাহিত্যের তেজ থাকে না, ভাল কাব্য রচিত হয় না, সেক্ষপীরর জন্মগ্রহণ করেন না; সে সমাজে সূক্ষ্মশিল্প লোপ পায়, চিত্রকার্য্য অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ভাস্কর-বিদ্যা অবনতির চরণসীমায় আনীত হয়। Ecce Homo

প্রণেতা তাঁহার Natural Religion নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল ;

First there is the great ideal of the artist. He has long cherished a secret grudge against Morality. The prudery of virtue is his great hinderances. He believes, that it is our Morality which prevents the Modern world from rivalling the arts of Greece. He finds that even the individual artist seems corrupted and spoiled for his business. If he allows Morality to get too much control over him. The great Master, he notices, show a certain indifference, a certain superiority to it, often they audaciously defy it." Natural Religior. P. 120—121

ভণ্ড রুচিওয়ালাদিগকে বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইরূপ মিষ্ট কথাগুলি উপহার দিয়াছেন ;—

"প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের মত নহে—ধিক্ এ কাল! তা সে ঘোমটা টুকু, প্রফুল্লকে ধরিয়া বসাইবার সময়ে সরিয়া গেল—ব্রজেশ্বর, দেখিল যে, প্রফুল্ল কাঁদিতেছে! ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া আ! ছি! ছি! ছি! বাইশ বছর বয়সেই ধিক! সেই ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, যে খানে বড় বড় ডব ডবে চোখের নিচে দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল—সেই স্থানে আ! ছি! ছি! ছি! ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুম্বিত করিলেন। গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই—কিন্তু ভরসা করি, মার্জ্জিতরুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।"

সকল বিষয়েরই মাত্রা, ওজন, পরিমাণ আছে। সংসারে যদি রস রহস্য বাদ দিয়া; শকুন্তলা, ওথেলোর অগ্নিসংস্কার করিয়া; দিন রাত কেবল,

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"

আরম্ভ করি, তাহা হইলে বাস্তবিকই জগৎ মরুভূমিময় হয়, এক মহা শ্মশান বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বালক।

কতকগুলা ছেলে বড় দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বভাব চরিত্র অতিশয় ঘৃণার্হ হইতেছে; যা মনে যায়, তাই করে; গুরুজনের কথা গ্রাহ্য করে না—তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নাই! সহর এবং পল্লীগ্রামের অধিকাংশ বালকই যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। পরিণামে যে কি হইবে, সে বিষয় তাহারা একদিনও ভাবে না, অথবা ভাবিতে জানে না।

১৫ বৎসর পূর্ব্বে যে বয়সের, যে শ্রেণীর বালকেরা গুরুজনের সাক্ষাতে অবনত বদনে থাকিত, এমন কি টেড়ি কাটিয়া বাহির হইতে লজ্জা বোধ করিত, এক্ষণে সেই শ্রেণীর বালকগণ অম্লান বদনে তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া হুঁকা কাড়াকাড়ি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সতের আঠার বৎসরের বালক কোথায় যত্ন করিয়া সারা দিন পড়াশুনায় মন দিবে;—তাহা না করিয়া ইয়ারকি এবং নেশার দিকে তাহাদের চঞ্চল চিত্ত সতত ধাবিত হইতেছে। নেশা কি এক রকম!—মদ, গুলি, গাঁজা, সিদ্ধি—অনেককে এই চতুরঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা বুঁদ হইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে; বলা বাহুল্য, তাম্রকূটধূমপান তাহাদের

নিকট কোনরূপ নেশার মধ্যেই গণ্য নহে। এরূপও দেখা গিয়াছে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই কতকগুলি বালক, মদ্য ও বেশ্যা—নেশাদ্বয়ে এরূপ মসগুল হইয়া উঠে, যে তাহারা যেন দিন রাত্রি অচেতন হইয়া থাকে। হিতোপদেশ বাক্য তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে না. শিক্ষকের প্রহারে তাহাদের চমক হয় না, প্রতিবেশীর দুর্ব্বাক্যে গ্রাহ্য নাই। এই সকল বালক আপনা হইতেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে ; অথবা কোন কোন সময়ে শিক্ষক তাহাদের দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া, শিক্ষা মন্দির হইতে---পিতামাতার বহু পাপের ফল সেই দুর্ব্বৃত্ত বালকবৃন্দকে দূর করিয়া দেন। বিদ্যালয় ত্যাগের পর এই সকল বালক প্রতিবেশীর উপর উপদ্রব আরম্ভ করেন, সমাজের জলন্ত কলঙ্ক স্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েন, পাড়ার শিষ্ট স্বভাব ছেলেকে স্বদল ভুক্ত করেন, মা বাপ আত্মীয় স্বজনকে কখন কখন প্রহারও করিয়া থাকেন। ছোঁড়াগুলা পরিণামে যে কি আছে, তাহা একবারও ভাবে না। পৈতৃক সম্পত্তি না থাকিলে উদারন্নের জন্য হা হা করিয়া কাল কাটাইতে হয় ; অনেক সময় জালিয়তি করিয়া জেলেও যাইতে হয়। আর পৈতৃক বিষয় থাকিলেই কি দুর্ব্বৃত্তগণ সচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে ? লক্ষ টাকা মুনফার বিষয় থাকিলেও সেই অবিমৃষ্যকারী কুসন্তানগণ অতি সত্ত্ব সময়েই অসংকার্য্যে সমুদায় সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে।

বয়স হইলে এই সকল কাঙ্গালমস্ত মহাত্মাগণ আপনাকে আবার বড় বাহাদুর বলিয়া ভাবেন ;—এক জন প্রকৃত বীরপুরুষ জ্ঞান করেন। বীর পুরুষ বা নন কিসে ? জননীকে, ভার্য্যাকে, ভগিনী যে প্রহার করিতে সক্ষম, তাহার বীরত্বের কম কিসে ?

তবে যদি বল, যে তিনি বীরপুরুষ হইয়া বারবিলাসিনীর পদাঘাত খান কেন? উত্তমাঙ্গে, সম্মার্জ্জনীর প্রহার সহ্য করেন কেন? অবোধ লোক না বুঝুক ক্ষতি কি!— কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কেবল "বীর ধর্ম্মের" ফল; (Chivalric spirit) "নার্য্যানুরাগ" নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, বীরত্বের পরাকাষ্ঠা তাঁহারা আরও অনেক সময় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। থিয়েটারকোম্পানী দুপয়সা রোজগারের জন্য নাটকাভিনয় করিতে প্রস্তুত হউক দেখি? ষণ্ডামার্ক বালকগুলা জোর করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া অভিনয়গৃহে প্রবেশ করিবার উদ্‌যোগ করিবে। এরূপ বিকট চীৎকার করিবে, যে, কর্ণে তালা ধরিবে; পরস্পর মারামারি করিয়া গুরু ব্যক্তির গায়ে গিয়া পড়িবে; সেই স্থানটিকে ভূতপ্রেতের আবাসভূমি মনে হইবে। সুতরাং বীরত্বের আর বাকি কি রহিল? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পূজা করিয়া গামছায় বাঁধিয়া, চাউল, কলা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া যাইতেছেন, বীরশ্রেষ্ট বালক তাহা খাইতে খাইতে চলিয়া গেল। শুভ্রকেশা, বিগতদশনা গোয়ালিনী কাঁখে কলসী লইয়া, যষ্টির উপর ভর দিয়া, দুধ যোগাইতে গুটি গুটি চলিয়াছে; মায়ের মুখউজ্জ্বল সেই বীরাবতার বালক, অমনি আন্তরাল হইতে ঢিল মারিয়া দুধপূর্ণ কলসী ভাঙ্গিয়া দিল,—আর হি হি, করিয়া হাসিয়া উঠিল। গোয়ালিনী বালককে গালি দিল, খানিক কাঁদিল, অবশেষে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। এরূপ কার্য্যে যদি বীরত্ব না হইবে, তবে ভব সংসারে আর কিসে বীরত্ব প্রদর্শিত হইবে বল?

বীর বটেন, তদপক্ষে কোন সংশয় নাই। কিন্তু মানুষ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হয় না কিনা,—তাই রাত্রিকালে কখন কখন

কুল-বধূর সাহায্য ব্যতীত বাহিরে আসিতে মহাপুরুষদের গাটা কেমন ছম্ ছম্ করে; আর একলা বহির্গত না হওয়া বুদ্ধিরও কাজ বটে; কারণ ভূত ত মানুষ নহে, উপদেবতা; কাজেই দলবদ্ধ হইয়া তিমিরাবৃত রজনীতে প্রাঙ্গণে আসা মহাবুদ্ধির কার্য্য। অনেকে বলিতে পারেন, যদি তারা প্রকৃত প্রস্তাবে বীর, তবে সাদা রঙের মানুষ, আর লালপাগড়ি দেখিলে, তাহারা এত ডরায় কেন? তখন তাহাদের বাক্য নিঃসরণ হয় না কেন? অচল, জড় পদার্থের মত প্রতীয়মান হয় কেন? তাহার কারণ আছে; সাধারণনিয়মকে বিশিষ্টরূপে বলবৎ করিতে হইলে, এক আধটা ব্যতিক্রম থাকা আবশ্যক। সুতরাং তাঁহাদের ভয়ই তাঁহাদের বীরত্বের পরিচায়ক; তাঁহারা নিঃসন্দেহ বীরপুরুষ। যে দেশের বালক এরূপ দুরাচার, অক্ষম, কাপুরুষ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, সে দেশের কি আর মঙ্গল আছে? ছেলেপিলের যাহাতে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শিক্ষা সহবৎ অভাবে বালকগণের এরূপ দুর্ম্মতি উপস্থিত হইয়াছে। পিতা, মাতা—অভিভাবকগণ কিরূপে ছেলে মানুষ করিতে হয়, তাহা ভাল জানেন না। শিক্ষকও শিক্ষা দিবার প্রণালী উত্তমরূপ জ্ঞাত নহেন; উচ্ছৃঙ্খল বালককে শাসনে রাখিতে অক্ষম।

না পড়ালি পো,
তো সহবতে থো।

জনক জননী, বঙ্গদেশের এ বহুপুরাতন কথাটি ভুলিয়া যাইতেছেন। কাজেই ছেলেগুলা একেবারে বহিয়া যাইতেছে।

হুগলী, চুঁচড়া, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি সহরে বিদ্যালয় যে নিতান্ত কম আছে, তাহা নহে। যে গুলি আছে, সে গুলিতে ভাল রকম লেখা-পড়া শিখান হইলে, বালকগণ এত খারাপ হইত না। অধিকাংশ শিক্ষকই যেন ঢিলে হইয়া গিয়াছেন; বালককে শিক্ষা দিতে, সদুপদেশ দিতে তাদৃশ যত্ন করেন না। সুতরাং বালকের জ্ঞানার্জ্জনের দিকে মতিরতি হয় না; কেবল দুশ্চিন্তায় মন পূর্ণ হইয়া থাকে।

আর বাপ মা ছেলেকে এত আদর দেন, যে, বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহারা গুরুজনের মাথায় চড়িয়া নাচিতে থাকে! আপনার ছেলেকে কে না ভাল বাসে? কিন্তু সেই ভালবাসার ছড়াছড়ি করিয়া পুত্রের ইহকাল পরকাল নষ্ট করা কি উচিত? এরূপ স্থলে জনক জননী "মা বাপ" নামের অযোগ্য। যদি বালককে সৎ-শিক্ষা দানের অভাব ঘটে, তবে পিতা শত্রু মাতা বৈরী।

পল্লীগ্রামের বালক যে আরও দুষ্ট হইবে, তদ্বিষয়ে বেশী কথা বলা বাহুল্য। দশখানা গ্রাম খুঁজিলে একটা পাঠশালা মিলিবে না; ৫০ খানা গ্রামের মধ্যে একটা ছাত্রবৃত্তির স্কুল দেখিতে পাওয়া যায় না; এক সহস্র গ্রামের মধ্যে একটা এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপিত হইলেই যথেষ্ট; দরিদ্রের সন্তান, যাহারা সহরে যাইয়া লেখা পড়া শিখিতে পারে না, তাহারা দিবা রাত্র হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতেছে; পৃথিবীতে যত কুকর্ম্ম আছে তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছে।

পিতামাতাও অশিক্ষিত,—সন্তানের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা জানে না। কাজেই বড় শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। যে সকল শিক্ষিতলোক সমাজ সংস্করণে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা কেবল বাল্য-বিবাহ বা বহু-বিবাহের ভাবনা

না ভাবিয়া, যাহাতে বঙ্গীয় বালকের রীতি চরিত্র শুধরাইয়া উঠে, সে বিষয়ে আর একটু যত্ন করিলে ভাল হয় না কি?

রুচি-কাব্য।

—০ঃ০—

প্রথম সর্গ।

আয়লো সুরুচি সতি! অনূঢ়া অবলা,
ধান-কাড়া প'রে—মোটা, ঘন, লম্বাচৌড়া;
কালকূট-ভরা কু-কণ্ঠের হও কর্ণধার,
দম, সতি! তুরন্ত সরস রসনায়—
গাব আজ রুচি-রসে মহা-ঋষি-গীত।
তুমিও আইস তবে সরলতা সখি,
আবরিয়া চারু-অঙ্গ,—সিমিজে কামিজে—
মুখে দিয়া জাল,—যথা থাকে গুটিপোকা
গুটির ভিতর। উভয়ে উরিয়া আজি
উদ্ধার এ দীন দাসে, এ গীত-সঙ্কটে।
দূর হও কলঙ্কিনী কু-রূপা কুরুচি,
কালাপেড়ে-পরা; পায়ে মল শিরে সীঁথি
হাতে বালা, গলে মালা, নাকেতে নোলক,
পাণ-রাগে রঞ্জিত অধর টুক্ টুক্,
মিশি দাগে কলঙ্কিত দন্তপাঁতি তোর,—
ছি ছি ছোঁব না তোরে,—না চাব চক্ষু মেলি,
সাধু-হৃদি-কাঁটা তুই, দূর হ'য়ে এবে।

প্রেম তুই দূরে যা ; 'ভালবাসা' আসিস্
না কাছে ; ভয় হয় ভাবিলে ও ভাব।
তুই ও-মা বীণাপাণি ক্ষমা দে গো আজ,
বীণার ঝঙ্কার তোর কুরুচি আধার ;
কটীতে কিঙ্কিনী-ধ্বনি, চরণে নূপুর—.
(সাধু সঙ্গে থেকে) শুনে মা শিহরে সব
অঙ্গ,—কাঁপে হৃদি গুরু গুরু ; যথা যবে
আশ্বিনের ঝড়ে রড়ে পড়ে কেঁপেছিল,
বাগানের কান্দি-পূর্ণ কলা-গাছ মরি !
বাজার মা বড় চড়া ; আজিকার কালে
বিধি, বিষ্ণু, বামদেব কল্কে নাহি পায় ;
ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শেষভাগে,
হতেছে সত্যের জয় একটানা শুধু ;
জননী গো ফিরে যা, এ ঘোর দুর্দ্দিনে,
শিক্ষাংগুণে রাঙ্গা-পদে বড় ভয়বাসি ;
সুরুচির শুভ্রকালে, আকাশের কোলে
চাঁদ তুই ডুবে যারে ; নিবুক নক্ষত্র ;
চন্দ্রমা গো হেসো নাহি আর রাঙ্গা রঙ্গে ;
বসন্তে বাসনা নাই, শীত হোক সদা ;
শুখাক্ কমলদল, শুখাক্ কুমুদ,
শুখাক্ নদীর জল, উড়ে যাক্ বালি,
পুড়ে যাক ফুল-কুল, কুঁড়ি কি ফুটন্ত ;
কোকিল ভ্রমর দোঁহে বোবা হায় যাক্
আকার, ঈকার কিম্বা নীকার, ভীকার—
লোপ হোক আজ হতে সুরুচি-রাজত্বে :

বাজাও বিজয় ব্যাণ্ড, সুরুচির জয়ে।
আয়লো সুরুচি সতি, রেলি-থান প'রে,
কাতর কিঙ্করে রক্ষ, উদ্ধার সঙ্কটে।

ইতি প্রস্তাবনা নাম প্রথমসর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

বসে আছে ভোলানাথ বিভোল হইয়ে,
—মিটি মিটি চায় কভু, কভু চোক বুজে,
বোতাম-বিহীন কপ, ঝল্ ঝল্ ঝোলে
জীবন-বিহীন-ঘড়ি পাকটেতে দোলে,
কলপ-বিহীন গোঁপ সুবদনে সাজে ;
খাঁটী-হীরা-হীন অঙটী, অঙ্গুলীতে রাজে,
ধীরে ধীরে কথা কয়, বহেনা নিশ্বাস,
পড়ে না পলক যেন, নাহি কাঁপে ঠোট—
মুখে নাহি হাসি কিম্বা দন্তের বিকাশ,
নত-শির বজ্রদগ্ধ আমুড়া গাছ যেন।
আহা কি অপূর্ব্ব শোভা, সুরুচি-রাজত্বে,
ডাকে কাক, ডাকে বক, ডাকে কাদাখোঁচা ;
চড়ুই, চামচিকা নাচে ঘুরিয়া চৌদিক ;
ফুটেছে ধুতুরা ফুল, শোভে ঘলঘসি ;
মাচায় উঠেছে পুঁই,—সুগম্ভীরে ধীরে।
হে দানবপতি ময়! দ্বাপরের শেষে
ভুষিতে পৌরবে, রচিলে অপূর্ব্ব সভা ;
তার শোভা কোথা ছার, এ শোভার কাছে!

স্বভাবের শোভা এই, কৃত্রিমতা নাই।
মহা-ঋষি ভোলানাথ আরম্ভিল তপ,
যুক্ত করে, উর্দ্ধমুখে ব্যোম পানে চাহি,
চক্ষে বহে জল—জীবের উদ্ধার হেতু।
"দয়াময় দীনবন্ধু প্রভু! পার কর
এ ভব-সাগরে, দুর্বিনীত দুষ্ট জীবে;
কু-কথায় কণ্ঠভরা, কু-চক্রী তাহারা
কথা নাহি শুনে মোর, না মানে আমায়,
(মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়;)
—সংসারে একাকী আমি, বন্ধুবল নাই,
কেমনে শাসিব তবে কোটী কোটী জীবে
—তাই আজি ডাকি তোমায় জগবন্ধু!
'নর-বিপরীত—জাতির' সে, নাম ধ'রে
ডাকে? শুনে লাজে মরি, অঞ্চলে লুকাই
মুখ; হৃদাকাশে কু-ভাবের কাল-মেঘ
হইলে উদয়, পোড়ে বক্ষ দাবানলে;
যথাযবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যশোদাজীবন-ধন শ্রীকৃষ্ণের সাথে,
দহিল খাণ্ডব বন, নির্মূল করিয়া।
প্রভু! পারি না সহিতে, আর ও কু—কথা,—
হিয়া জর জর;—ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে
অসি করে ধরি, ধরিয়া চামুণ্ডা মূর্ত্তি,
বধি তারে রণে;——————"
"হায়! হায়! কি কহিতে কি কহিনু; ভুলে
গেছি বা। "নর বিপরীতজাতি"। [illegible]

রসনা! খসিয়া পড়, কণ্ঠ! রুদ্ধ হও,
ঠোঁট! নড়িওনা—এপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই!
কি কথা কহিনু! নিজ পদে মারিনু কুঠার
নিজ দোষে মুখপোড়া হনু মহাবীর—"
বলিতে বলিতে হায়, নয়নের বারি,
বিগলিত হলো, নিশ্বাস বহিল ঘন,
শোক-ঝড় উঠিল আকাশে; ভোলানাথ
ভূমিতলে গেলা গড়া গড়ি; কলেবর
ধূলায় ধূসর; ফেনিল বদন; জিহ্বা
পড়িল বাহিরি; চেতনা নাহিক আর;
পড়েছে জটায়ু যেন রাবণের বাণে,
যবে শ্রীরামের "নরাবিপরীত মূর্ত্তি"
রাবণের রথে দেখি, যুদ্ধিলে জটায়ু।
কতক্ষণ পরে তবে পাইয়া চেতন,
ভোলানাথ দিব্যজ্ঞান লভি, ধীরে
বাম হাতে মলি দুই কাণ, পুন সেই
হাত বুলাইল মুখে; কার্য্য সিদ্ধি করি,
ডান করে চাকু ছুরি দৃঢ়বদ্ধ ধরি,
বলিল সক্রোধে "রে রসনে! ফের্ যদি
শয়নে স্বপনে কিম্বা নিদ্রা অচেতনে,
বল, আর, অই কথা—কুচি কাটি কটি
তোরে ফেলাইব সমুদ্রের নীরে দূরে"
ইতি প্রতিজ্ঞা নাম দ্বিতীয় সর্গ

———

ব্রহ্মডাঙ্গায় কুলগাছ।

বাঙ্গালা ভাষা যেন নাওয়ারিশ মাল—যেন ব্রহ্ম-ডাঙ্গার কুলগাছ, যার ইচ্ছা সেই দখল করে,—দুটা কুল পেড়ে খায়। আজ কাল অনেকেরই গ্রন্থকার, সাজিবার বাসনা; কিন্তু সাজিলে হয় কি? পরচুলায় তো টাক রোগ সারে না; মেষ, সিংহচর্ম্মে আবৃত হইলেই তো সিংহধর্ম্ম পায় না; বর্ণজ্ঞানহীন মানব শুকদেব গোস্বামীর মুখস্ পরিলে ত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে পারেনা। কিন্তু এ কথা শুনে কে? ঢাল নাই, হাতিয়ার নাই, সদাই নিধিরাম সর্দ্দার সাজিবার সাধ। ইহাতে নিজের বিড়ম্বনা, সমাজের অবমাননা, ভাষার লাঞ্ছনা, গুরুজনের গঞ্জনা, আর গ্রাহকগণকে বঞ্চনা ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই। বাপু হে! জিজ্ঞাসা করি, তোমার পক্ষাঘাত-গ্রস্ত, অর্দ্ধমৃত, বিশুষ্ক হাতে কি বলিয়া তীক্ষ্ণধার তলোয়ার ধরিতে চাও? ইহাতে তোমার লজ্জা না হউক, কিন্তু অপরে বড়ই লজ্জিত হয়। ছেলেপিলে কোথায় লেখা পড়ায় মন দিবে,—না,—পদ্য লিখিতে আরম্ভ করিল; পুস্তকের মলাটে পদ্য লিখে, অঙ্কের খাতায় পদ্য লিখে—যেন দ্বিতীয় রামপ্রসাদ অবতীর্ণ। আবার এখনকার বাপ খুড়াও যেন কেমন কেমন হইয়াছে; ভাবিল ছেলের বুঝি দৈববিদ্যা জন্মিয়াছে, হয় ত শিক্ষককে নিষেধ করিয়া দিলেন, ছেলেকে যেন অঙ্কশাস্ত্রের জন্য পিড়াপীড়ি না করা হয়,—কবি কখন আর্কিমিডিস্

হইতে পারে না,—পদ্যের সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্রের চিরদিনই ভাসুর ভাদ্রবধূ সম্পর্ক। এদিকে পরিপক্ক ছেলে আর নীচে পানে চান না, এক দৃষ্টে নীল-নভোমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া থাকে; নীচে কেবল পার্থিব গদ্যের জঞ্জাল, উপরে কেবল স্বর্গীয় পদ্যের বাগান; উপরে চাঁদ, নিচে গোবর; উপরে মলয়মারুতসেবিত সরস-বসন্তে মধুকর গুণগুণায়তে, নীচে গ্রীষ্মের গুমট গরমে মাছি ভণভণায়তে,—স্বভাব কবি আর নীচে চাহিবে কেন? নয়নতারা দুটী কপালে চড়িয়াই রহিল; যেন ব্রহ্মরন্ধ্রে চক্ষু হইলে সুবিধা কিছু বেশী হইত। এইরূপে স্বভাব-কবি হেলে-দুলে মুচ্‌কি হেসে, বাহু তুলে বিহ্বল হয়ে, কবিত্ব-কাননে বেড়াইয়া বেড়ান। স্বভাব-কবি লইয়া ত এই জ্বালা, দ্বিতীয় জ্বালা স্বভাব-গ্রন্থকার লইয়া। কেরাণী-গিরি জুটিল না, নব্য বাবু গ্রন্থ লিখিতে বসিলেন। বুকে চাদর-বাঁধা, টেড়ি-কাটা, পমেটম-মাখা "এলে ফেল" বাবু গ্রন্থ লিখিবার আড়ম্বরে নগর তোলপাড় করিয়া তুলিলেন—সহসা যেন ভূকম্প উপস্থিত হইল। ভরসা, কেবল একমাত্র 'বিজ্ঞাপনে।' রামচন্দ্র হনুমানের সাহায্যে সীতার উদ্ধার করেন, গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সাহিত্যসাগর তরিতে চাহেন। হয়ত নবপুস্তকের দুপাতের অধিক কালীর আঁখর পাড়া হয় নাই, গ্রন্থকার বিজ্ঞাপন দিলেন, "বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তক এই নূতন। বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নূতন পুস্তক। শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। দুই হাজার ছাপা হইতেছে, ইহার মধ্যেই ১৯৯৯ জন গ্রাহক হইয়াছে। গ্রাহকগণ অতি শীঘ্র পত্র লিখিবেন; একমাসের মধ্যে মূল্য দিয়া গ্রাহক না হইলে দ্বিগুণ মূল্য দিতে হইবে। ইহাতে সাগরগর্ভউত্থিত ধন্বন্তরীর সুধাভাণ্ডের অমৃত আছে,

দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র আছে, ভবানীপতি মহাদেবের ত্রিশূল আছে, শ্রীকৃষ্ণের মোহনবাঁশী আছে, গোপিনীকুলের মধুর হাসি আছে, মিল আছে, মোক্ষমূলর আছে, গেটে আছে, সাড়ে আঠার ভাজার সকলি আছে,—এখন উন্নতমনা পাঠকবৃন্দ এই গ্রন্থ এক এক খণ্ড পাঠ করিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করুন, স্বদেশ উদ্ধার করুন। বিজ্ঞাপনের ত এই প্রথম আরম্ভ; ইহার উপর আর কত বক্কাল আছে—ক্রমে লেখা হইল—"মার্জ্জনীয়া রমণীকুলের অনুনয় বিনয়ে গ্রাহকগণকে অর্দ্ধ মূল্যে আরও দুইসৎসর সময় দেওয়া হইল।"

এই সকল গ্রন্থকারের একটী মহাভয়, পাছে—পাঠক মনে করেন, গ্রন্থকারের বিদ্যা কম বা তিনি কম-ইংরেজী জানেন। সেই ধারণা দূর করণার্থ আবার নানা কৌশলের সৃষ্টি হয়। গ্রন্থ মধ্যে দেখিবেন, লাটিন, জর্ম্মাণ, ফরসী ভাষার মধ্যে মধ্যে কোটেশেন; কোন পাতের শেষে লেখা আছে, "See Mill on Liberty" "See Dequiency on Keats." "Vide the Holy Bible." অথবা—কোথায় দেখিবেন, "গেটে অমুক দিন অমুক কথা—বলিয়াছিলেন;" "বেদে ঠিক্ এই কথা লেখা আছে; "হোমার এই বিষয়ের সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন।" প্রথমত, গ্রন্থকার হইয়া চীনেবাজারী দোকানদারী, তাহার উপর আবার বিদ্যা দেখাইবার আড়ম্বর—এই ত্র্যহস্পর্শে ঐ গ্রন্থ প্রকৃতই বঙ্গভাষায় এক নূতন অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইয়া উঠে।

গ্রন্থকারের কথা ছাড়িয়া দি। এক্ষণে আর এক ধরণের নূতন লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের সুর সদাই পঞ্চমে চড়িয়াই আছে,—তাঁহাদের লেখার সরু মোটা নাই,—নরম গরম নাই; মঠেকড়া নাই,—যেমন জিনিস হউক, সেই একছাঁচে ঢালিতেছেন।

"মাঠের ধান শুকাইতেছে, যদি আর সাত দিন মধ্যে বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে এবার অর্দ্ধেকের বেশী ফসল নষ্ট হইবে।" সুধু এইকথাটী তাঁহাদিগকে লিখিতে বলুন, দেখিবেন, তাঁহারা কি একটা ভয়ানক কাণ্ড করিয়া তুলেন। তাঁহাদের লেখার ধরণ এইরূপ,—"অহহ! কি দুর্দ্দৈব! শস্য-শ্যামলাবসুন্ধরার কমনীয় কান্তি আজ পরিম্লান; তৃণশষ্পসমাচ্ছাদিত ময়দানের নন্দন কাননতুল্য সে অপার্থিব সৌন্দর্য্য আর নাই,—হরিদ্বর্ণ-ধান্যপুঞ্জ-বিশুষ্ক-জীবন হইতেছে,—ঔষধাভাবে আপপ্রেক্ষি-রোগগ্রস্ত-রোগী যেন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। অদ্য হইতে সপ্ত দিনের মধ্যে পর্জ্জন্যদেব যদি অনুগ্রহবারি বর্ষণ না করেন, তাহা হইলে, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি অর্দ্ধেকের অপেক্ষা—অধিক সার-শস্য বিনষ্ট হইয়া প্রকৃতি-পুঞ্জের পীড়া উৎপাদন করিবে!" আজকাল অনেকের এই-রূপ একটা ধারণা দাঁড়াইয়াছে, যে ভাষা মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ঘোর নিনাদ করিতে না পারে, যে ভাষা সিংহবিক্রমে হুঙ্কার রবে শ্রোতার কর্ণ বধির করিতে সক্ষম না হয়, সে ভাষা ভাষাই নহে। এ রূপ সংস্কার নিতান্ত ভ্রমপুর্ণ। সকলই উপযুক্ত সময়ে। প্রাতে ললিতে সুর ধর, দ্বিপ্রহরে সিন্ধু, সন্ধ্যায় পুরুবীর আলাপ কর—শুনিতে কেমন মিষ্ট লাগিবে। তাহা না করিয়া, তাঁহারা দিনে বেহাগ, রাত্রে ভৈরবী করিয়া তুলেন। উপসংহারে আমাদের কথা এই, প্রথমে শিক্ষা চাই, ভুয়োদর্শন চাই, ভাষা জ্ঞান লাভ করা চাই, বানান ভুল দুরস্ত করা চাই,—তার পর দিন কত মক্স করুন,—লিখুন, কাটুন, আবার সংশোধন করুন, কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলুন, এইরূপ আট-ঘাট-বাঁধিয়া শেষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন, কবি হউন, গ্রন্থকার

হউন, প্রবন্ধ-লেখক হউন, ইহাতে সকল পক্ষেরই মঙ্গল আছে।

জামাই বাবু।

নীলমণি বাবু অতি স্বাধীন প্রকৃতির লোক। চেহারা খানি একহারা—পাতলা ডিগ্‌ডিগে, হাড়েমাসে জড়িত। তাঁহাতে শারীরিক বল, আধিভৌতিক বল না থাকুক; কিন্তু তাঁহার দেহাভ্যন্তরটা আধ্যাত্মিক তেজে ভরা। চব্বিশ ঘণ্টাই অগ্নিশর্ম্মা; মুখের কাছে, কথা কয়, সাধ্য কার? যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ—প্রতিলোমকূপ দিয়া সদাই যেন একটা ঝাঁজ বাহির হইতেছে। তিনি যখন তখন মুখে এইরূপ বুলি বলিতেন, "আমি কি কারো তোয়াক্কা রাখি; হক্ কথা বল্‌বো, তা বাবাই হোক্ না কেন, আর গুরুই হোক্ না কেন?"

নীলমণি বাবু চিরকাল "ঘর-জামায়ে।" চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তাঁহার শুভবিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের ক দিন পরে, বা ক সপ্তাহ পরে, তিনি শ্বশুরগৃহে এই চির-অব-স্থিতির সূত্র-পাত করেন, তাহা আমার জানা নাই। তবে এমনটা শুনি-য়াছি, তিনি ফুলশয্যার পর দিনই, বাপের বাড়ী হইতে নবপরিণিতা স্ত্রীর সহিত এক পাল্কীতে শ্বশুরবাড়ী আগমন করেন; সেই দিন হইতেই তাঁহার "ঘরজামায়ে" কাজের সূত্রপাত।

নীলমণি বাবুর শ্বশুর সেকেলে সেরেস্তাদার। তালুক মুলুক আছে। এখন সুদি কারবারে খুব বড় মানুষ। কৌলীন্যের অনুরোধে তিনি নীলমণিকে জামাই করেন। জামাইকে

ঘরে আনিয়া তিনি প্রথমে গ্রাম্যস্কুলে তাঁহাকে পড়িতে দিলেন। নালমণি বাবুর পাড়াগেঁয়ে স্কুল মনে ধরিল না, কাজেই শ্বশুর তাঁহাকে হুগলীতে পাঠাইয়া, মাসিক ২০৲ টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। লেখাপড়া শেষ হইলে, ঘরের জামাই, শ্বশুর-ঘরেই ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে বয়স প্রায় ২৮ হইল। নীলমণি বাবুর ঘুম ভাঙ্গে বেলা আটার সময়। তার পর তিনি মুখ হাত ধুয়ে চা খান। চা খাইয়া ভ্রমণে বহির্গত হন। বেলা বারটার সময় প্রত্যাগত হইয়া স্নানাহার পূর্ব্বক, দিবা-নিদ্রায় অভিভূত হন। বৈকালে উঠিয়া পাশা খেলিতে বসেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জলযোগ করিয়া, আবার পাশা এবং তামাকে মনোযোগ দেন। এক মটর আপিং খান। এইরূপে শ্বশুরের কার্য্য-উদ্ধার করিয়া নীলমণি বাবু দিন অতিবাহিত করেন।

নীলমণি বাবু নানাগুণে বিভূষিত। শ্বশুর তাঁহার উপর এত অত্যাচার করে, তথাচ তিনি শ্বশুরবাড়ীর উপর বিরক্ত হন না। তিনি আপিঙ সেবন করেন, রাত্রে দুই সের দুধের দরকার ; - কৃপণশ্বশুর পাঁচ পোয়া বই দুধের বরাদ্দ করেন নাই। দিনের বেলা ভাতের সঙ্গে যে অন্তত এক ছটাক ঘি দিলে নীলমণি বাবুর সুবিধা হয়, পোড়া শ্বশুর তাহাও বুঝে না। নীল-মণি বাবু এত ভালমানুষ যে এসব মর্ম্মকথা শ্বশুরের সাক্ষাতে এক দিনও বলেন না ; কেবল দুই এক জন প্রিয়বন্ধুকে গোপনে বলেন,—"এমন ক'রে আর থাকা যায় না, আপনারা ভাল খাবেন, আর আমাকে কেবল ওঁচা জিনিস দিবেন।"

নীলমণি বাবুর পিত্রালয়ে যে কি আছে, তাহা কেহ জানে না। তিনি সর্ব্বসমক্ষে বলেন যে, আমার বাপের বাড়ীতে বড় বড় ঘর আছে, বড় বড় বাগান আছে, বড় বড় পুকুর আছে।—

সবই আছে, কেবল বাপের বাড়ীর বাপ্‌টী নাই। কিন্তু দুষ্ট লোকে কাণাকাণি করে, পিত্রালয়ে তাঁহার চাল চুলা নাই, ভীটা নাই, একটা ভেরেন্দা গাছও নাই।

বারমেসে কালী ঠাকুরুণ দেখিয়াছি, বারমেসে আমগাছেরও নাম শুনিয়াছি। কিন্তু নীলমণি বাবুর মত বারমেসে-জামাই পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। পাড়ার লোকে তাঁহার "বারমেসে" নাম দিয়াছিল; তবে তাঁহার সাক্ষাতে কেহই সে নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। নীলমণি নাম একটু বাঁকা করিয়া বলিলেই তিনি ক্রোধে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেন; বারমেসে-জামাই বলিলে কি তিনি আর রক্ষা রাখিতেন?—সকলকে একেবারে উবু উবু গিলিয়া ফেলিতেন। তবে অনেকে তাঁহাকে প্রকারান্তরে ঠাট্টা করিত। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে কয়েকটী ভদ্র লোক বসিয়া আছেন। নীলমণি বাবু গিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে অমনি মহাসমাদরের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন,—"আসুন, নীলমণি বাবু, আসুন, আসুন, বোস্‌তে আজ্ঞা হউক"—আদরে নীলমণি অমনি গলিয়া গেলেন। তখন নীলমণিকে মধ্যস্থলে বসাইয়া সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন। কোন ব্যক্তি অতি সজোরে চেঁচাইয়া ভৃত্যকে বলিলেন,—"ওরে, শীগ্‌গির বাবুকে তামাক দে।" ভৃত্য হুঁকায় জল পূরিয়া আমপাতায় একটা নল করিয়া তামাক সাজিয়া আনিয়া নীলমণির হস্তে হুঁকাটী দিল। ১ম ব্যক্তি বলিলেন,—নীলমণি বাবু, ইহা কোথাকার আমপাতা জানেন না কি?

নীলমণি। না, তা ত জানি না,—বেশ ভাল পাতা বোধ হচ্চে।

১ম। অতি উৎকৃষ্ট পাতা; আমার বারমেসে আমগাছের পাতা কখন খারাপ হয় না।

নীলমণি। বারমাসই কি আপনার গাছে আম হয়?

২য়। বারমাসই হয়, একটী দিনও কামাই নাই।

৩য়। অতি সুন্দর আম, বারমেসে গাছ— রোজ আম পেড়ে খাও।

নীলমণি। আমার বাপের ও একটা বারমেসে আমগাছ ছিল।

১ম। শুনেছি, শুনিছি,—আপনার ৺ পিতাঠাকুরের* খুব এক বড় আম বাগান ছিল, বাগানের মধ্যস্থলে সেই বারমেসে গাছটী থাকিয়া বাগান আলো করিত। নীলমণি বাবু, সে বাগান এখন হলো কি?

নীলমণি। আর কি বোলবো মেশাই, থাক্ সে কথা।— আমি কি এখন আর একটী আম চোখে দেখ্‌তে পাই—সে সব আম ভূতে লুটে খায়।

১ম। কেন নিজের বিষয় আশয় সম্পত্তি আপনি দেখেন না?—আপনার ত অনেক ক্ষতি হচ্ছে, আমরা দেখিতেছি! দেখে শুনে আমাদের কষ্ট হয়।

নীলমণি। ও ত শুধু আমগাছ; আমার বড় পুকুরের বড় বড় মাচগুলো কেবল না দেখার দরুণ মরে গেল।

২য়। আমাদের সকলের অনুরোধ,—আপনি একবার বাড়ী যান। আপনার বিষয় দেখুন, শুনুন, রক্ষা করুন,—এরূপ সম্পত্তি না দেখিলে চলে কি?

নীলমণি। হুঁঃ, আপনারা ত আমাকে যেতে বল্লেন,— আমাকে শ্বশুর ছেড়ে দেন কৈ?

৩য়। আপনি শ্বশুরের হাত ছিনিয়ে চলে যান, এতে যা সাহায্য করিতে হয়, তা আমরা কর্‌বো। পুলিষ-কেশ হয়, আমরা চালাবো। আপনি নির্ভয়ে চলে যান। শ্বশুর যদি

এসে পথ আটকান, আমরা যেয়ে তাঁহার হাত ধোরে, পথ থেকে টেনে আনবো।

২য়। শ্বশুরটার কি আক্কেল দেখেচো—জামাই বাবুকে আট্‌কে রেখেছে।

১ম। কাজেই আগুলে রাখতে হয়। বাবুকে না হলে যে শ্বশুরের একদণ্ড চলে না, সংসার অচল হয়—কাজেই নীলমণি বাবুকে আগুলে রাখ্‌তে হয়।

নীলমণি। ঠিক্ বলেছেন,—আমি না থাক্‌লে, এতদিন শ্বশুরের বিষয় আশয় সব মাটী হতো। এমন আর বিনা মাহিনার চাকর কোথা পাবেন?

১ম। আপনি এই ১৪ বৎসর কাল এখানে আছেন; মাসে যদি আপনি ১০৲ টাকা করিয়া পাইতেন, তাহা হইলে আজ আপনার দুই হাজার টাকা হাতে হইত। আপনি নেহাইত ফাঁকিতে পড়িয়াছেন। শ্বশুরই আপনার পরকালটা খাইল। আপনি আজই এখনই বাপের বাড়ী চলে যান। আমরা চাঁদা করিয়া আপনার রাহা খরচ দিচ্ছি।

নীলমণি। (একটু বিচলিত হইয়া) আমিত পিত্রালয় যেতে অরাজি নই; তবে আমি গেলে শ্বশুরের কষ্ট হয়, এই আমার দুঃখ। তা কালই যাবো,—শ্বশুর মহাশয়কে বুঝিয়ে বলে, কাল যাবো। আজ আমি তবে আসি। এই বলিয়া বেগে সেস্থান হইতে নীলমণি বাবু প্রস্থান করিলেন। এরূপ শুনা গিয়াছে, তিনি তিন মাস কাল সে পথ মাড়ান নাই!

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

———

কাঁটা-আইন!

দয়াল বাবু খুব বিষয়ী লোক। সংসারের সারতত্ত্ব সমস্তই তিনি অবগত আছেন। তিনি বলেন, এ সংসারে সবই দোকানদারী। দুনিয়ার হাটে, আদান প্রদান এবং বেচা কেনা ব্যতীত, আর কোন কথা নাই। মনুষ্য এ জগতে ব্যবসা করিতে আইসে, ব্যবসা শেষ হইলে চলিয়া যায়। মজা দেখুন, পৃথিবীর সকলেই ব্যবসাদার। হাকিম ব্যবসাদার—পয়সা লইয়া বিচার-বিতরণ কাজে নিযুক্ত; উকীল ব্যবসাদার—পয়সা লইয়া মোকদ্দমা চালাইতে নিযুক্ত; প্রজা ব্যবসাদার, জমী চসে পয়সা রোজগারের জন্য; জমীদার ব্যবসাদার,—জমীদারী কেনে টাকার জন্য; রাজা ব্যবসাদার—রাজ্যজয় করে, টাকার জন্য; ফল কথা, পৃথিবীর সকলেই ব্যবসাদার। তবে আমাদের এ ব্যবসায় লোকের এত চোক টাটায় কেন? লোকে একটী আমের আঁটী পুঁতে ভবিষ্যতে আম খাইবার জন্য, গাঁছটী জমা-বিলি করিবার জন্য। গাছের গোড়ায় জল দেওয়া, ছাগল তাড়ানো,—সমস্তই সেই ভাবিফল আমটীর জন্য। মানুষ, বিড়াল পুষে, ইন্দুর ধরিবার জন্য; কুকুরকে একমুটা অন্নদি, রাত্রিতে আমার বাড়িতে সে পাহারা দেয় বলিয়া। আর এই যে আমার এত-কষ্টের-ছেলেকে মানুষ করিলাম,—ইহা কি বৃথায় যাইবে? দুধভাত খাওয়াইয়া যাদুমণির নবীন নধর গড়ন করিলাম, স্কুলে টাকা খরচ করিয়া একটা পাশ করাইলাম,—এত পরিশ্রম এবং মূলধন খরচ হইল, সমস্তই কি আমার জলে পড়িবে? না, তা কখন হইতে পারে না; সংসারের তা নিয়ম নয়,। ব্যবসায়ে চক্ষু লজ্জা করিলে, ধনা

বিবাহ সভা।

বরের বাপ। তবু যে এ দিকে ঝুঁকচে।

কনের বাপ। আরত আমার কিছু নাই, সবই দিয়েছি। এখন গিন্নিকে দিলে যদি হয়, ত এনে দি।
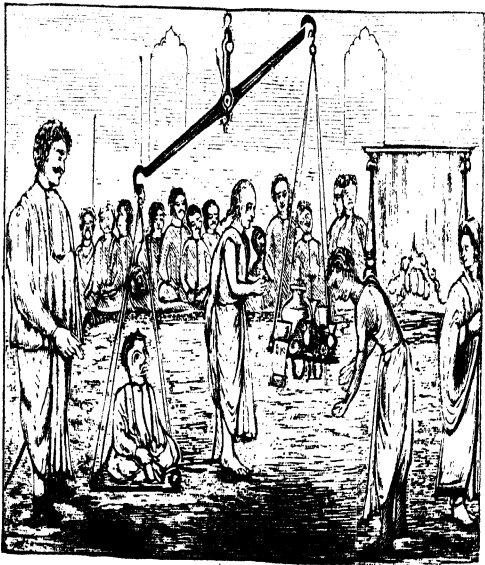
মাটী হয়। আর চক্ষু লজ্জাই বা কিসের? উচিত মূল্যে মাল বেচিব,—তোমার পছন্দ হয়, প্রাণ চায়, তুমি লইবে; মনে না ধরে, ফিরিয়া দেখিবে। এ ব্যবসাদারী-কাণ্ডে আমি কেন লজ্জাশীলা কণে-বৌয়ের মত ঘোমটা দিয়ে বোসে থাকবো? খাইয়ে মাখিয়ে লিখিয়ে পড়িয়ে, সহবৎ দিয়ে, ছেলেটাকে তৈয়ার করিলাম, এখন তুমি বল কি না,—"আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দাও, অধিক টাকা দিতে পারবো না!" কেন, আমি কম টাকা লইব? ছেলে বিকায় না কি? আশ্বিন মাসের পূজার মর্‌শুমে ফুটে পাটায় কড়ি হয়, আর এই অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ-ব্যবসার ঘোর মর্‌শুমের সময়, আমার যাদুর নিশ্চয়ই দ্বিগুণ দর হবে;—বিশেষ, ইহা খাঁটি মাল, কোন ভেজাল নাই। হরলাল বাবুর মেয়েটী সুন্দরী বলে যে, আমার ছেলের দাম কম হইবে, তাহা কখনই নহে। সে সুন্দরী আছে সেইই আছে—তাতে আমার কি? ভবিষ্যতে ছেলে চাকুরীদ্বারা রোজগার করিয়া আমাকে টাকা দিবে বটে,—কিন্তু ছেলের মধ্য-থাকের রোজগার আমি ছাড়ি কেন? আমি কিছু আর গয়াক্ষেত্রে পুণ্য করিতে আসি নাই যে, এখানে টাকা বিলাইব। দোকান খুলিয়াছি, জিনিস সুমুখে সাজাইয়াছি, চুটিয়ে ব্যবসা চালাইব। বেচাকেনার সময় খাতির, লজ্জা থাকিলে, ব্যবসা চলে না।

বলি, তোমাদের এত হিংসা কেন? আমি মর্‌শুমে দুটাকা রোজকার করিব, তোমরা তাতে বাধা দিবার কে? তোমরা নাকি বলে বেড়াও, পণ-প্রথা ভাল নয়, টাকা লওয়া ভাল নয়—কেন? তোমার নিজের ছেলে একটী তৈয়ারি হলে তখন বুঝতে পার্‌বে—টাকা লওয়া ভাল কি মন্দ? তোমরা নেহাইত অব্যব-সায়ী, তাই ওসব কথা মুখে আনো। উপযুক্ত সন্তান থাকিলে,

ওসব কথায় তোমাদের মনে কষ্ট হইত কি না, বুঝিতে পারিতে! আমিও উঠ্‌তি বয়সে বলিতাম, পণ-প্রথা অতি জঘন্য। কিন্তু যখন ছেলেটী হলো, ঘি দুধ খাইয়ে ছেলেকে বড় করিলাম, তখন বুঝিলাম, পণ-লওয়াকে খারাপ বলা কতদূর অন্যায়। বাপ্‌! প্রাণ থাকৃতে কি, ও-জিনিষকে-খারাপ বল্‌তে পারি? আর এখন দু দশ স্থান হইতে ছেলের দর পাইয়াছি, এখন কি আর আমি ছেড়ে কথা কই? যখন ব্যবসা বাণিজ্য শিখি নাই, তখন মূর্খের মত, "পণ-লওয়া ভাল নয়" বলা সহজ ছিল, কিন্তু এখন ব্যবসায়ী হইয়া অব্যবসায়ীর মত কথা কেমন করিয়া কহিব?

তবে তুমি একদিন বলিতে পার—"পণ লওয়া ভাল নয়।" সে কোন্‌ দিন? কোন উপযুক্ত সময়ে?—যখন আমার মেয়েটীর বিবাহ দি তখন আমিই লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইতাম, "হিন্দুসমাজে কি বিষম কুপ্রথা প্রচলিত দেখ দেখি? মেয়ের বিবাহ দিব, গৌরী দান করিব, ইহাতে বরের বাপ বলে, আমাকে নগদ হাজার টাকা দাও। ছি। ছি! ছি!—এ পাপ প্রথা উঠাইবার জন্য পিনাল-কোডের ধারা বাড়ান উচিত।" কয়েক দিন মাত্র এই কথাটী লোকে আমার মুখে শুনিয়াছিল; যেন-তেন-প্রকারেণ যাই আমার মেয়ের বিবাহ হইয়া গেল, অমনি আমি নীরব—ও কথা আর ভুলেও মুখে আনিলাম না। এখন ও-আপদ বালাই-মেয়ে আর নাই—কেবল সারি সারি চারিটী ছেলে। এখন আমার পাথরে পাঁচ কাল। এখন আমার হাতে, রঙের গোলাম-নহলা-টেক্কা-সাহেব, আর একটী টেক্কা বড় পঞ্চাশ। এ ব্যোমের তাস, আমি এখন ছাড়ি কি? আর, কোন্‌ পাষণ্ডের কথায় আমি এ সুখের খেল ত্যাগ করিব? এই আমার প্রথম ছেলের বিয়ে, কাঁটায় ওজন করে, সোণারূপার দানসামগ্রী গহন

নগত টাকা লইব। কাঁটা একচুল এদিক ওদিক হলে, সমস্তই ফেরত দিব। বঙ্গে এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ না হইলে আমার সুবিধা নাই। কারণ ক্রমান্বয়ে আমাকে এখন এ ব্যবসা চালাই-তেই হইবে। দেশহিতৈষীগণ, আমার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এখন কোথায়? শুধু বিধবার বিবা-হের আইন জারি করাইলে ত চলিবে না, আমার জন্যও একটা আইন তৈয়ার করিয়া দিন। বঙ্গের অনেক বাপ-মা আপনার উপর চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। ব্যবস্থাসচিব হুইটলী ষ্টোক্‌স আজ কোথায়? আপনি বিবাহের কাঁটা-আইন প্রচলিত করুন। তোমরা বুঝি মনে করিতেছ, এ আইনটী পাস্ হইলে কেবল আমারই উপকার! হুঁঃ কতলোক মনে মনে যে খুসী হইতেছেন তাহা আর কি বলিব? আমি ত অদ্য কাঁটায় ওজন করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলাম; কিন্তু ভাবনা ভবিষ্যতের জন্য। সেই জন্য বলি, যাঁহারা এ বিষয়ে ভুক্তভোগী, তাহারা সকলে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। শীঘ্রই আমরা দলবদ্ধ হইয়া, সমস্বরে, মুক্ত-কণ্ঠে, গবর্ণমেণ্ট সমীপে কাঁটাআইন জারির জন্য প্রার্থনা করিব।

আইনত হইবেই। কতকগুলি মোটামুটী গার্হস্থ্য নিয়ম, ছেলের বাপ্‌কে জানাইয়া রাখিব। বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে, ছেলেটীকে মোটা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ছেলে দমে খুব ভারি হওয়া দরকার। এজন্য পুত্রকে ঘি, মাখম, ছানা, ননী, দুধ প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে। অচিরে ছেলেটী, মোটা সোটা নাদুস নুদুস হইয়া উঠিবে; যত মোটা, তত লাভ। গ্রামফেড্ মটন অধিক দরে বিক্রীত হয়। আর আমার এ মাখনফেড্ ছেলে অবশ্যই খুব চড়া মূল্যে বাজারে বিক্রয় হইবে।

যে উপায়ে হউক, ছেলেটীকে একটী পাশ করাইতে হইব
ছেলেটীর এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যে, বর-দেখি
আসিলে সে বলিবে, সোণার মই, সোণার ঘড়া, এবং সো
পাল্কী নহিলে, সে বিবাহ করিবে না।

একাদশী বাঁড়ুয্যে।

ধনকুবের বলিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের খ্যাতি। লো
কাণাকাণি করে, তাঁহার শয়ন ঘরে, মাটীর নীচে পোঁতা টাকা
শেওলা পড়িয়া যাইতেছে। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকে
তাঁহার ঘরে একটী সুগভীর গুপ্ত কূপ আছে। তাহার প্রথ
তবকে মোহর, দ্বিতীয় তবকে নবাবী আমলের গেঁড়ি টাকা
তৃতীয় তবকে সাহেবমুখো টাকা, চতুর্থ তবকে বিবিমুখো টাক
সাজান আছে। তাঁহার কাছে একশত লাখ, কি, একশত
কোটী টাকা আছে, এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই স্থিরমীমাংসা
হইল না।

ইহাতে গেল ভূগর্ভস্থ গুপ্ত টাকা। ইহা ব্যতীত বহিঃ-
প্রদেশে বিস্তর টাকা ছড়ান আছে। কর্জ্জ দান করা তাঁহার
জীবনের এক মহাব্রত। প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা তাঁহার সুদী
কারবারে খাটিতেছে। যাকে তাকে তিনি সহজে ধার দেন
না। যিনি বিশেষ বিপদগ্রস্ত, তিনিই তাঁহার কর্জ্জদানের
বিশেষ প্রিয়পাত্র। কাল অষ্টমের নিলাম, আজ জমীদার
যদুনাথ বাবু গিয়া তাঁহার হাত দুটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছেন,

'বাঁড়ুয্যে মহাশয়, এবার আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। আর দিন নাই, আজই আমাকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ দিতে হইবেই হইবে। আপনি না দিলে আর উপায় নাই।"

বাঁড়ুয্যে। তাইত; টাকা ত আমার হাতে নাই। যা ছিল, সবই গিয়াছে, রামহরি বাবু সে দিন ষাট হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়া গেলেন। বোল্‌বো কি, হাতে যদি আমার একটা কাণা কড়ি থাকে, তবে সে গো-রক্ত, ব্রহ্ম-রক্ত!

যদু। সে কি মহাশয়! আপনার হাতে টাকা নাই কি? আপনি না দিলে এখন যাই কোথা? দেখুন, খুঁজে পেতে; আপনার অক্ষয়ভাণ্ডারে টাকা খুঁজলেই পাওয়া যাবে!

বাঁড়ুয্যে। আর কি সেকাল আছে? এ বৎসর যে কি করে সংসার চালাবো, তাই ভাব্‌চি। চাল, ডাল, তেল সবই মাগ্‌গি;—হাতে একটী পয়সা নাই;—মেয়েদের কাছে হাওলাত করে, এ মাসের খরচ চালিয়েছি। বানে দেশ ভেসে গেল; আমার নিজ জোতের জমীতে এক ছটাক ধান নাই। ভেবে ভেবে আমার গায়ের রক্ত শুকিয়ে যাচ্চে। শিরঃপীড়ার দরুণ কবিরাজ আমাকে মাথায় একটু বেশী তেল মাখিতে ব'লেছেন; তা যদু বাবু আপনার কাছে এ কথা গোপন করে আর ফল কি?—এ বছর আমি ভরসা করে মাথায় একটু বেশী তেল মাখিতে পারি না। সিঁড়ি ভেঙ্গে ছাদে উঠিতে হলে মাথা ঘোরে। তা কি কর্‌বো? পয়সা নাই, দুর্ব্বৎসরে কুলায় না, কাজেই কষ্ট করে থাক্‌তে হয়।"

বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের প্রকৃত পক্ষেই গা ও মাথা রুখু। চুল-গুলা কর্‌কর্‌ করিতেছে। সত্য সত্যই জলপ্লাবনের পর দিন হইতে তিনি তেল মাখা কমাইয়াছেন। কোন দিন একটু

তেল মাখেন, কোন দিন বা একেবারেই ফাঁক দেন। পায়ে গ্রাম্যমুচির তৈয়ারি, মান্ধাতার আমলের এক জোড়া ছেঁড়া চটী জুতা। পরিধানের কাপড়খানি খুব মোটা;—দুই তিন স্থানে তালি দেওয়া; কিন্তু তাহা হাঁটুর নীচে অধিক নাবে নাই। তবে হরে-দরে ঠিক আছে। ঐ মোটা ঘন কাপড় একটু পাত্‌লা হইলেই তাহা অবশ্যই ভূমিতলে লুটাইত। হিসাবে গোল নাই; তবে এ সব গূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার জন্য একটু সূক্ষ্মবুদ্ধির আবশ্যক। এই নিদারুণ শীতকালে মোটেই তাঁহার গাত্রবস্ত্র নাই। রাত্রে একখানি নিজহস্তে শেলাই করা কেঁথা গায়ে দেন। খুব ভোরে উঠিয়া, কোঁচার টেপ গায়ে দিয়া, সাজি হাতে করিয়া ফুল তুলিতে যান। এক এক দিন শীতে হি হিকরিয়া কাঁপিয়া উঠিলে, তিনি সুর করিয়া সংস্কৃত শ্লোক আওড়ানঃ—

শয়নে পদ্মনাভঞ্চ, ভোজনেচ জনার্দ্দনং।
দুঃস্বপ্নেস্মরগোবিন্দং বিপদি মধুসূদনং॥

হঠাৎ কারও সহিত তখন সাক্ষাৎ হইলে, তিনি বলেন, "কাপড় গায়ে দিয়া ত ফুল তুলিবার যো নাই; কি করি, কাজেই আদুড় গায়ে এ শীতে ফুল তুলিতেছি।" ফুল তোলার পরই গৃহে আসিয়া রোদে পিঠ দিয়া, তামাক খাইতে বসেন। দেখিতে দেখিতে ৯ টা বাজিয়া যায়, সূর্য্যের তেজ প্রখর হয়। সুতরাং গায়ে বস্ত্র দিবার আর সময় হয় না। আর সন্ধ্যার পর বাহিরে তিনি কোন দিনই বসেন না; একেবারে গৃহে গিয়া, নিজকক্ষে সেই কেঁথা গায়ে দিয়া, শুইয়া থাকেন। তবে লোকে বলে, তাঁহার অতি পুরাতন কাশ্মীরী একখানি শাল আছে। কিন্তু সে শালখানি আজ প্রায় বার বৎসর হইল, বাহিরে কেহ দেখে নাই; প্রবীণ

ব্যক্তিরা বলেন, ৭১ সালের ঝড়ের বৎসর ঐ শাল তাঁহারা এক দিন দেখিয়াছিলেন। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের একটী পুকুর আছে—তাহাতে বিস্তর বড় বড় মাছ! কিন্তু তিনি একটী মাছও ধরেন না,—বলেন, জীবহিংসা মহা পাপ! স্বয়ং কাঁচকলা ভাতে, খেসারির ডাল ভাতে, তেঁতুল গুলে ভাত খান,—আর বাড়ীর মেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে বড় বড় মাছ ধরিয়া লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ হজম করেন। কর্ত্তাটী যতই অহিংসা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, এ দিকে ততই পুকুরের মাছ কমিয়া যায়। গিন্নিটী, কর্ত্তাকে বুঝাইয়া বলেন, মাছ সব, ভোঁদড়ে খাচ্চে।

এখন আসল কথা। যদু বাবু বলিলেন, যদি পাঁচ হাজার টাকা না পারেন, আমাকে যেমন করিয়া হউক, আজ চারিটী হাজার টাকা দিতেই হবে।

বাঁড়ুয্যে। কি জানেন যদু বাবু, আমার হাতেত একটী পয়সাও নাই। মেয়েদের কিছু টাকা আছে। তা মেয়েরা বেশী সুদ না হলে টাকা কর্জ্জ দেয় না। সুদই তাদের উপজীবিকা; আমার নিজের টাকা থাকলে, টাকা প্রতি মাসে দুই পয়সা সুদ দিলেই চলিত। মেয়েরাত কারো কথা শুনে না, তারা চারি পয়সা সুদের কম টাকা ছাড়বে না।

যদু। বলেন কি মশাই, আমি যে একবারে মারা গেলাম। এত সুদ দিতে হ'লে যে আমি সর্ব্বস্বান্ত হবো। একটু দয়া করুন—

বাঁড়ুয্যে। সুদই আমাদের সম্বল। আমার জমীদারী নাই, লাখরাজ নাই, বাগান নাই, অধিক কি, যে দুবিঘা জমী ছিল, তাহাতেও এবৎসর ধান নাই। একজনকে দশটাকা দান করিতে

পারি, কিন্তু সুদের একটা পয়সাও ছাড়িতে পারি না। নদে জেলার রামহরি ঘোষালের সহিত আমার বরাবর কারবার চলিয়া আসিতেছে; এই পূজার পূর্ব্বে তাঁর কাছে সাড়ে আট শত টাকা দশ আনা আড়াই পয়সা সুদের পাওনা হলো। তিনি বলেন, আড়াই পয়সা আর দিব না; আমি বলিলাম, মহাশয় মাপ করিবেন, সুদ কম লওয়া নীতিবিরুদ্ধ। এক জনের কাছে কম লইব, অপরের কাছে বেশী লইব—ইহা বড়ই অন্যায় কথা! লোকে আমাকে জুয়াচোর, ঠক বলিতে পারে। বিশেষ, এখন যদি আপনার কাছে কম সুদ লই, তাহা হইলে রামহরি ঘোষাল মহাশয় বড়ই দুঃখিত হইবেন।

যদু। বাঁড়ুয্যে মহাশয়! আপনি এ কথা রামহরি ঘোষালকে নাই বা বলিলেন? আমাকে কম সুদ দিলে কেহই জানিতে পারিবে না।

বাঁড়ুয্যে। (হোহো করিয়া হাসিয়া) এখানে কেউ না জানিতে পারেন,—সেই অন্তর্য্যামী ভগবান ত সব জানিতে পারিবেন। পাপত মনে। তা হবে না—আজ টাকা প্রতি চারি পয়সা সুদ দিলে, মেয়েদিগকে বুঝাইয়া, বহুকষ্টে আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা এনে দিতে পারি।

যদু। না হয়, মশাই তিন পয়সাই নেবেন, চারি পয়সা সুদ লইলে একেবারে মারা যাব।

বাঁড়ুয্যে। তা হবে না, আমি কথার ঠিক রাখি। আমার কাছে কস্মিন কালে আপনি দু কথা পাবেন না। কথার যার নড় চড় হয়, সে মনুষ্য মধ্যে গণ্য নহে। আমার মরা বাপ যদি ফিরে এসে বলেন পোণে চারি পয়সা সুদ লও, তাহা হইলেও রাজি হই না।

যদু। [যোড়হাতে] আপনি আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করুন —আপনার আমি পায়ে ধরে—

বাঁড়ুয্যে। ছি ছি! আপনি অতি বড় লোক, সম্ভ্রান্ত কুলীন। আপনার খেয়েই আমরা মানুষ। আমি আপনার চাকরের ও যোগ্য নই। আমি গরিব মানুষ, আমার কাছে কি আপনার হাত যোড় করিতে আছে ?

যদু বাবু গতিক দেখিয়া নীরব হইলেন। তখনই জমাদারী বন্দক দিয়া যদু বাবু, বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে খত রেজেষ্টরি করিয়া দিলেন। অমনি পাঁচটা তোড়ায় পাচ হাজার টাকা বাঁড়ুয্যে মহাশয় গণিয়া দিলেন। যদু বাবু বলিলেন, আপনার কাছে নোট নাই কি ?

বাঁড়ুয্যে। নোট আমি বুঝি না। আমার নগদ টাকায় কারবার।

যাত্রাকালে যদু বাবুকে বাঁড়ুয্যে বলিলেন, "এক ছিলিম তামাক খাইয়া যান—বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর হলো।" যদু বাবু তখনও বাসিমুখে একটু ও জল দেন নাই,—স্নান আহ্নিক করেন নাই, বিষম বিষয় চিন্তায় অন্তরটা তাঁর ধুক্ ধুক্ করিতেছে; তিনি আর পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন না, বেগে অষ্টমের টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

একটা বড় গোলের কথা আছে। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের নাম কেহ জানে না। সকলে তাহাকে একাদশী বাঁড়ুয্যে বলে। দশ খানি গ্রামে, অথবা বঙ্গের সর্ব্বত্রই তাঁহার ঐ নাম রাষ্ট্র। ক্রমে আসল নাম লুপ্ত হইয়া ঐ নামই প্রচার হইয়াছে। ফল কথা, তাঁহার পিতৃদত্ত আদত নাম তাঁহার গৃহিনী ব্যতীত আর কাহারও স্মৃতিপথে আছে কি না সন্দেহ। বাঁড়ুয্যে

মহাশয়কে কেহ একাদশীই বলুক, আর পূর্ণিমাই বলুক, অথবা ধরিয়া কেহ দু'ঘা জুতাই মারুক, কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই; কড়ায় গণ্ডায় কাগ ক্রান্তিতে তিনি হিসাব করিয়া সুদ পাইলেই মহাসন্তুষ্ট। কিন্তু দুষ্ট লোকে তাঁহাকে দেখিলেই আপন মুখটী অমনি কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ফেলে। তাস খেলিতে খেলিতে যদি একপক্ষ চারিখানা কাগজ ধরে, অপর পক্ষ তৎক্ষণাৎ "একাদশী-বাঁড়ুয্যে-রবে' সেই তাস চারিখানায় একবার হাত বুলাইয়া দেয়। এমনি তাঁহার নামমাহাত্ম্য, নিশ্চয়ই সেই চারিখানা তাস উঠিয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে বাঁড়ুয্যে মহাশয় এক জন দেশবিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন। ইতিহাসে তাঁহার নাম উঠিবে কি না, ঐতিহাসিকগণ এখন কেবল দিবারাত্র এই ভাবনাই ভাবেন।

দ্বিতীয় ভাগ

সমাপ্ত।

—